বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ-বৃত্তান্ত

সৌমেন পাল

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

।। ১ ।।

মানুষের এবং সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে আগুন ও যন্ত্রের আবিষ্কারের মতন ছাপার উদ্ভাবন এক অর্থে যুগান্তকারী ঘটনা। বর্তমান পৃথিবীর চেহারার মূলে যে ছাপার আবিষ্কার রয়েছে তাও অনস্বীকার্য। কারণ সভ্যতার আদি থেকেই মানুষ তার চিন্তা, ধ্যান ধারণা, সাহিত্য,দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান সমস্ত কিছুকেই সংরক্ষণ করার এবং স্থায়িত্ব দেবার প্রয়োজন বোধ করেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে ছাপার উদ্ভাবনের মাধ্যমেই। ছাপার মৌলিক সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় একটি লেখা বা একটি ছবির একাধিক প্রতিরূপ।

খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে কাগজ আবিষ্কৃত হয় চীন দেশে। চীনে ছাপার শু কাঠ খোদাই দিয়ে। চৌকো এক রকমের কাঠের উপর লেখা বা ছবি কুঁদে নিয়ে কালি মাখিয়ে রোলার দিয়ে ঘষে কাগজের উপর ছাপা হত। এইভাবে চীনে একরঙা ছবি ছাপা হয় তাং রাজত্বকালে (৬১৮-৯০৫ খ্রিঃ) পৃথিবীর প্রথম বই 'হীরকসূত্র', বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের চীনা অনুবাদ ছাপা হয় ৮৬৮ খ্রিঃ। মুদ্রাকরের নাম ওয়াং চিয়েহ্‌, বই-এর মাপ ছিল ষোল ফুট লম্বা আর এক ফুট চওড়া ছটি পাতা এবং সামনের পাতায় চমৎকার কাঠখোদাই ছবি।

কাঠখোদাই -এ ছাপার পর প্রায় ১০৪০-১০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চীন দেশে উদ্ভাবিত হয় মাটির ছাঁচে তৈরি 'মুভেবল' বা অদল বদল করা যায় এরকম আলাদা আলাদা হরফ। মাটির হরফ কয়েকবার ব্যবহারের পর ভেঙে যেত খুবই তাড়াতাড়ি , ফলে কাঠের হরফ বা ব্লক-এর সৃষ্টি হল। এরপর প্রায় ১৫শ শতাব্দীতে কোরিয়ার ছাপাখানার লোকেরা ধাতুর উপর খোদাই করে ছাপার ব্যবস্থা করেন। ছাপার বিবর্তনের ইতিহাসে এটা একটা বড় ঘটনা। এই ১৫শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ইউরোপে ছাপার সূত্রপাত। ইউরোপের প্রথম ব্লক বুক বা কাঠখোদাই-এর ছাপা বই ধাতুর হরফে ছাপা বই-এর পরে বেরোয়।

১৪৫০-৫৫ খ্রিঃ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় সময়, কারণ এই সময় আধুনিক পদ্ধতিতে ছাপার জন্ম হয়। জন্ম দেন যিনি তাঁর নাম জোহান গুটেনবার্গ। তাঁর ছাপা এই বাইবেল এখনও পর্যন্ত সর্বকালের সেরা ছাপা বই-এর মধ্যে অন্যতম। গুটেনবার্গের বাইবেলের পরে অতি দ্রুত ছাপার ব্যবহার এবং ছাপার পদ্ধতি জার্মানী ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ১৪৭০ থেকে১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিকোলাস জেনসন ও আলড্রুস মানুটিউস নামে দুজন মুদ্রাকর ভেনিসে বেশ কিছু অসাধারণ বই ছাপেন যাতে দেখা যায় হরফের চরম উৎকর্ষ। এঁরা বুঝতে

পেরেছিলেন যে ছাপাখানা একটা অন্য মাত্রার ব্যাপার, শুধুমাত্র কালি, কলম বা বুশ-এর সমাহার নয়। এর নিজস্ব জগৎ, ধর্ম এবং নিয়মাবলি আছে। ছাপার মধ্যে যে হরফের ব্যবহার তার বিবর্তন একটা অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ছাপার সৌন্দর্য, প্রতিটা পাতা পড়ার সুবিধা এবং লেখার বিষয়বস্তুর চাক্ষুষ রূপ ফুটিয়ে তুলতে হরফ নির্বাচন একটা প্রধান ব্যাপ ার। ১৪৭০ থেকে ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে ছাপা পশ্চিম ইউরোপের সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়ে এবং যন্ত্রযুগের প্রসারণের স াথে সাথে ছাপা বহুমুখী হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র বই-এর মধ্যে বদ্ধ না থেকে পত্র-পত্রিকা, খবরের কাগজ, প্রচার পুস্তিকা, ব্যবস ায়িক বিজ্ঞাপন পুস্তিকার নির্মাণে ছাপা ব্যবহার হতে থাকে। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ছাপার ব্যবহার ইউরোপ ছাড়িয়ে অ ামেরিকায় যায়।

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ গুটেনবার্গের বাইবেল ছাপার ঠিক ১০০ বছর পরে এবং পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের বছরে ভ ারতবর্ষে ছাপার প্রথম আগমন হল গোয়ায়। ১৬৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে, তারপর গুজরাট এবং মাদ্রাজের ত্রাঙ্কুভ ার এ ছাপার কাজ শু হয়। অবশেষে গোয়াতে ছাপাখানা আসার ২২২ বছর পরে বাংলাদেশে ছাপাখানা এল ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে।

।। ২ ।।

বই ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়ে এল, এরপর বাঁধানো হল। বিভিন্ন পদ্ধতিতে, বিভিন্ন উপকরণের সমন্বয়ে বই বাঁধানো হল -- এরপরই যার প্রয়োজন পড়ে, সে হল বই-এর প্রচ্ছদ। জনসমক্ষে বই-এর প্রথম প্রকাশ প্রচ্ছদের মাধ্যমে। সে দূর থেকে এক ঝলক দেখেই হোক বা হাতে নিয়েই হোক। প্রথম দর্শনেই যা মনকে ছুঁয়ে যায় তা হল প্রচ্ছদ। কোন্ বই-এর কেমন হবে প্রচ্ছদ সে সম্পর্কে যেমন ভাবনা থাকে লেখকের, ভাবনা থাকে প্রকাশকের এবং যিনি প্রচ্ছদ রচনা করেন তাঁরও। এরই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ছাপার খরচের কথা। আবার ছাপার পদ্ধতির আধুনিক উন্নতি এবং প্রয়োগের সঠিক চিন্তাধার ার প্রয়োজনও হয়ে পড়ে। সর্বোপরি শিল্পের নান্দনিক মূল্যবোধও ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে বই-এর প্রচ্ছদ রচনার ভাবনায়। যে কোন পাঠক অথবা ত্রেতার প্রথম দর্শনেই প্রেম জাগায় প্রচ্ছদ। সাহায্য করে সেই বই-এর মূল ভাবকে বুঝতে। বই-এর ভিতরে মনোনিবেশ করতে আগ্রহ জাগায়। বিশেষ করে পাঠকের কাছে একেবারে যে বই নতুন, আগে পড়া নেই, তার প্রতি এক গভীর অনুসন্ধিৎসাজাগায় নয়নমনোহর অথচ শৈল্পিক সুষমামণ্ডিত প্রচ্ছদ। অর্থাৎ বহিরঙ্গের আবরণ দিয়ে বই-এর মূল ভাবনা যাতে সঠিক ভাবে ফুটে ওঠে তারই রূপ ফুটে উঠে প্রচ্ছদ ভাবনায়।

বই-এর অলংকরণের সঙ্গে সঙ্গে সুষ্ঠু সুন্দর প্রচ্ছদ রচনার কাজে হাত দিয়েছেন শিল্পীরা আবার অনেক সময় লেখক নিজেই। কেমন হবে প্রচ্ছদ -- শুধু বই এর নাম থাকবে, নাকি থাকবে কোন ছবি? আবার সে ছবি হবে কি হাতে আঁকা, না কি কোন ফটোগ্রাফ? কিংবা কেমন হবে ছাপার পদ্ধতি, একরঙা, দুরঙা না বহুরঙা? এ নিয়ে যেমন ভাবনা চিন্তার শেষ নেই তেমনই ছাপার পদ্ধতির ত্রমবর্ধমান অগ্রগতিরও শেষ নেই।

।। ৩ ।।

১৭৭৮ সালে ছাপা হল বাংলা প্রথম বই ‘এ গ্রামার অফ দি বেংগল ল্যাঙ্গুয়েজ’, হুগলী থেকে, মুদ্রাকর ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ রাজকর্মচারী চালর্স উইলকিন্স্। প্রথম বাংলা অক্ষর এঁকে, কেটে, আলাদা আলাদা করে ঢালাই করে বাংলা ছাপার হরফ তৈরি করেন উইলকিন্স্, এবং তাঁকে সাহায্য করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। এই পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাই মনোহর কর্মকারই পরবর্তীকালে কেরীর শ্রীরামপুরের ছাপাখানার হরফ তৈরি করেন। কিন্তু কেমন ছিল সে বই-এর প্রচ্ছদ ? যতদূর খোঁজ পাওয়া যায় আখ্যাপত্র অথবা নামপত্র যেমন ছিল তেমনিই ছিল এর প্রচ্ছদ। অর্থাৎ আর নতুন করে প্রচ্ছদের জন্য হরফ কাটার প্রয়োজন হয়নি সম্ভবত খরচ এবং সময়ের কথা ভেবেই। আখ্যাপত্রের ছবিতে দেখা যাচ্ছে বই-এর মূল ভাবনা বা বত্তব্যটি বড় পরিস্ফুট। অর্থাৎ GRAMMAR কথাটির দিকেই দৃষ্টি প্রথমেই

আটকে যায় এবং তারপর চোখে পড়ে BENGAL LANGUAGE -- - সুতরাং বত্তব্য পরিষ্কার। মজার ঘটনা এই, বই ব াংলায়

হলেও নাম কিন্তু ইংরাজিতে।

অষ্টাদশ শতকে, এই কলকাতাতেই ছাপাখানা ছিল ১৭টি, মুদ্রাকর ছিল ৪০ জন তবে তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন ইউরোপীয়। ১৭৯৯ সালের মধ্যেই তাঁরা খুব কম করে ৩৬৮টি বই ছেপেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের বই, তাতে ছবিও ছিল ধাতু খোদাই এবং কাঠ খোদাই-এরও।

এই সময় কলকাতায় বেশ কিছু পশ্চিমী শিল্পীরা এসেছিলেন এবং ছাপাখানায় উন্নতির প্রসার তাদের কাজকর্মকে চাক্ষুষ রূপ দিতে সাহায্য করল। ইংরাজিতে হলেও উল্লেখযোগ্য ডানিয়েল-এর Twelve Views of Calcutta, সলভিনস-এর Etchings, বেইলির
Views of Calcutta ১৭৮৬-৮৮-৮৯-এর মধ্যে কলকাতা থেকেই ছাপা হল। তবে ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত ছাপখানাতে
দেশীয় লোক কাজ করত এবং তারা হরফ তৈরি এবং ব্লক কাটায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিল।

।। ৪ ।।

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হল, খিদিরপুরে বাবুরাম নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তানের পরিচালনায় এবং প্রথম বাঙালি প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছাপলেন প্রথম বাঙলা সচিত্র বই 'অন্নদামঙ্গল'। কেমন ছিল এই বই-এর প্রচ্ছদ? সে খোঁজ পাওয়া এক দুষ্কর ব্যাপার। এ ঘটনা বোধ হয় পুরোনো সমস্ত বই-এর ক্ষেত্রেই অনিবার্যভাবে প্রযোজ্য। বই থেকে যায়, যত্ন করে বাঁধিয়ে রাখাও হয় কিন্তু প্রচ্ছদ? তার কপালে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া মনে হয় আর কিছুই জোটে না। অথচ এই প্রচ্ছদই তো বলে দেয় সেই বই-এর বক্তব্যের প্রথম আবেদন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বই বহুবার পড়ার ফলে এবং হাতে হাতে ঘোরার ফলে প্রচ্ছদ বিবর্ণ মলিন তো হয়ে যায়ই আর ছিঁড়েও যায়। বিশেষ করে পাতলা কাগজের মলাট হলে তো কথাই নেই। আবার বই বাঁধাইয়ে যে বোর্ড ব্যবহার করা হয় তাও অনেক ক্ষেত্রেই পোকায় কেটে দেয় বা নষ্ট হয়ে গেলে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে বাঁধিয়ে রাখার প্রচলনই বেশি। ফলে আদি প্রচ্ছদটির অবলুপ্তি এক ধরনের অঙ্গহানিরই সামিল। প্রচ্ছদ এমনই এক জিনিস যা একবার নষ্ট হয়ে গেলে ফিরে পাওয়া যায় না, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বই থাকলেও দেখা যায় যে প্রচ্ছদ নেই। কী থাকত এই প্রচ্ছদে?

।। ৫ ।।

১৮১৭ সালে, চলছে কাঠ খোদাই করে চিত্র রচনার পালা। এরই মধ্যে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল ইঙ্গ-ভারতীয় উদ্যোগে 'স্কুল বুক সোসাইটি ' --- উদ্দেশ্য দেশীয় লোকেদের পড়ার জন্য বই ছাপা। ১৮২২ সালে জন লসন নামে এক ইংরেজ এই প্রকাশ থেকে প্রকাশন করেন সচিত্র বাংলা মাসিক 'পশ্বাবলী'। ছবিগুলো তাঁরই হাতে আঁকা এবং খোদাই করা। এই মাসিকটির প্রত্যেক সংখ্যায় একটা করে জন্তুর বিবরণ এবং প্রথম পৃষ্ঠায় সেই জন্তুর একটা কাঠ খোদাই চিত্র থাকত। লসন ছিলেন মুদ্রণ শিল্পে সুশিক্ষিত, দক্ষ চিত্রকর। অপেক্ষাকৃত বড় মাপের হরফকে ছোট করার কৌশলটি তিনিই প্রথম শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কর্মীদের শেখান এবং তাঁর সবিশেষ কৃতিত্ব বাংলা আর চীনা হরফের উন্নতি সাধন।

১৮৫১ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হল 'ঠাকুরদাদার হস্তিবিষয়ক ইতিহাস'। যার প্রচ্ছদে দেখতে পাই কাঠ খোদাইয়ে ছাপা একটি অত্যন্ত মনোহর বর্ডার বা ফ্রেম-এর ছবি এবং অপেক্ষাকৃত বড় হরফে বই-এর নাম লেখা। সেই সঙ্গে 'Calcutta School Book Society'লেখা ও ছাপা। এই সময়ের ছাপা বই-এর মলাটে দেখা যেত ঐরকম বা অন্য ধরনের বর্ডার বা
Frame-এর ব্যবহার। তবে সম্ভবত প্রচ্ছদ ছাপা হত মূল বই-এর থেকে ভিন্ন ধরনের কাগজে--সামান্য লাল বা গোলাপী পাতলা কাগজে। যেখানে বই-এর নাম বড় অক্ষরে, লেখক এবং কোথায় বা কোন্ যন্ত্রে ছাপা হয়েছে তা ছোট অক্ষরে ছ

াপা হত। অনেক সময় কাঠ খোদাই ছবিও ছাপা হত।

বাংলা প্রকাশনের ইতিহাসে বটতলার বইয়ের অবদান একাধিক। গুরত্ব দিয়ে বটতলার বইয়ের কথা যাচাই করলে বোঝা যায় যে এই সাহিত্য তৎকালীন সমাজের প্রতিচছবি এবং মুদ্রণযন্ত্রের বিবর্তনের চিহ্ বহনকারী। সস্তায় বই ছাপা এবং বিক্রি করার মতো অথচ জনপ্রিয়তায় তুঙ্গে ওঠার মতো ইতিহাস বটতলার। বিষয় বৈচিত্র্যতেও বটতলার বইয়ে কী ছিল না --- ধর্ম থেকে শিশুপাঠ্য বই, চিকিৎসাবিদ্যা থেকে ভাষাশিক্ষা, নাটক নভেল থেকে প্রেমপত্র লিখন শিক্ষা, পঞ্জিকা থেকে পাঁচালী --- শেষ নেই বিষয়ের। প্রচছদও ছিল সস্তা কাগজে ছাপা, বই-এর নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম, কোন কোন বই-এর প্রচছদে কাঠখোদাই ছবিও থাকতো, এমনকি পিছনের মলাটে বিজ্ঞাপনও।

চিৎপুর এলাকায় সব থেকে নামকরা প্রকাশক, নৃত্যলাল শীল-এর ১৮৬৮ সালে ছাপা নিধুবাবুর 'গীতরত্নমালা'র মলাটে এদেরেই আটান্নটা বই-এর বিজ্ঞাপন ছিল। ১৩০৯-এ ছাপা একটি প্রহসন শ্রীরাধাবিনোদ হালদার প্রণীত 'পাসকরা মাগ' ছাপা হল। প্রচছদে দেখা যায় বইয়ের নাম, লেখকের নাম ছাড়াও নগ্ন নারী মূর্তি। অর্থাৎ বটতলার বই-এর প্রচছদে এসে গেল নারীদেহের চিত্রের ব্যবহার। আবার ১৮৯৫ সালে বটতলা থেকেই পূজো উপলক্ষে প্রকাশিত একটি পুস্তিকার প্রচছদে ব্যবহৃত হল দুর্গাঠাকুরের খোদাই ছাপ চিত্র। মজার ব্যাপার এই যে পুস্তিকাটির নাম কী তা নেই অথচ দাম রয়েছে লেখা, প্রচছদেই রচয়িতা এবং প্রকাশকের নাম ছাড়াও রয়েছে ইংরাজি হরফে লেখা পাবলিশারের নাম, ঠিকানা, সাল। প্রচছদে চলে এল এই বিবরণও।

প্রসঙ্গক্রমে এটা লক্ষ করা যায়, যে প্রচছদে বই-এর বা পুস্তিকার নাম ছাড়াও এক লাইন বা দু লাইনে সেই বইয়ের সামান্য বিবরণ দেওয়ার রেওয়াজ ছিল এবং অক্ষরের মাপের হেরফের ছিল মূল সজ্জার ব্যাপার যা দিয়ে মানুষের চোখ অথবা মনকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা। ১২৯৬ সালে ছাপা 'রাধা-সঙ্গীত' এর প্রচছদে নামাক্ষর ছাড়াও লেখা দেখা যায় "অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণের বিরহ বর্ণনা"। আর বর্ডার বা ফ্রেম তো আছেই। এই সব প্রচছদের আরো একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল রং নির্বাচনে। মাত্র এক রঙে ছাপা অক্ষর --- সে কালোই হোক বা গাঢ় নীল, বাদামীই হোক, কাগজের রঙ কিন্তু বই-এর কাগজ থেকে আলাদা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লাল অথবা গোলাপী রঙের কাগজ ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ Background-এ রঙিন কাগজ ব্যবহার করে দু রঙের আভাস দেওয়া সস্তা অথচ চোখে পড়বে সেই উদ্দেশ্যে এই ভাবনা।

।। ৬ ।।

কেমন ছিল (১৮১৫-১৯) সালের মধ্যে ছাপা রাজা রামমোহন রায়-এর অনুবাদে বেদান্ত সূত্র ও উপনিষদের ধর্মমতের বইগুলির প্রচছদ? সে আভাস সম্ভবত পাওয়া যায় এখনকার ব্রাহ্ম সমাজের প্রাপ্ত বইগুলির প্রচছদের মধ্যে। হালকা হলদে রঙের কাগজের উপর লাল রঙে Letter Press-এ ছাপা বই এবং লেখকের নাম এখনও ব্রাহ্ম সমাজের বইয়ের ললাট লিখন হয়ে আছে। ১৮৫৪ সালে কলকাতায়
স্থাপিত হল খোদাই, কাঠখোদাই, এচিং, লিথো প্রভৃতি পদ্ধতি শেখার স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট, ১৮৫৫ সালে ১৭ই এপ্রিল ছাপা হল বাংলা শিশুশিক্ষায় এখনও পর্যন্ত BestSeller বইয়ের ১ম সংস্করণ, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ, জুন-এ হল ২য় ভাগ, কিন্তু এই আদি সংস্করণ-এর 'বর্ণপরিচয়' অথবা বিদ্যাসাগরের জীবিতকালের মধ্যে প্রকাশিত 'বর্ণপরিচয়' ১ম ভাগের সন্ধান পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার, প্রচছদ তো দুর অস্ত্। তবে মনে হয় যেহেতু এই বই দুটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, মানবমনে প্রথম পাঠের স্মৃতি গেঁথে রাখে তারই আভাসে এখনকার অন্ততপক্ষে রিসিভারের সংস্করণের মতোই প্রচছদ ছিল। সেই লাল পাতলা কাগজে কালো Letter Press-ছাপা, বড়
করে লেখা 'বর্ণপরিচয়' এবং মাঝখানে বিদ্যাসাগরের অথবা রিসিভারের সীল। ১৮৫৬-তে ছাপা হল 'কথামালা'। সমস্যা একই, ১৯২৯ সালের একটা সংস্করণে দেখা যায় মলাটে সেই বিখ্যাত কাক শেয়ালের গল্পের ছবি, বই এবং লেখকের নাম --- মলাটে বইয়ের গল্পের ছবিকে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে -- ব্লকের খরচা বাঁচানোর জন্য। তবে ক

াগজের রঙ আলাদা। একটা ঘটনা লক্ষণীয় যে সে বটতলাই হোক বা বিদ্যাসাগরই হোক সবক্ষেত্রেমলাটের রঙ বা ক াগজ ভিন্ন ধর্মী, বইয়ের থেকেই। অর্থাৎ বইয়ের মলাটকে আকর্ষণীয় বা চোখে পড়ার মতন প্রয়াস একটা থেকেই গেছে। এরপর একধরনের বই এল যার বাঁধানোই ছিল দেখবার বা চোখে পড়বার মতন বিষয়। লাল বা সবুজ কাপড়ে বাঁধানো। ভেতরে তুলোর মতন নরম কিছু দিয়ে বালিশের মত ফুলোনো। উপরে কোন ছবি কিছু নেই কিন্তু অসাধারণ ঝকঝকে সে ানা অথবা পোর রঙে বই এবং লেখকের নাম খোদাই (Emboss)করা। সে বইয়ের মলাটের জাতই আলাদা --- হাত দিয়ে অন্য অনুভূতি---সাজসজ্জার ঘনঘটায় যেন বনেদী রাজপুষের বেশ। মাইকেলের চতুর্দশপদী কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ ছিল সবুজ রঙের মলাটের চারপাশে সোনালী বর্ডার। আবার বাংলা গ্রন্থ চিত্রণের আদি পর্বের প্রতিভাধর শিল্পী গিরীন্দ্রকুমার দত্তের সম্পর্কে গবেষক মন্মথনাথ ঘোষ লিখছেন 'মাইকেলের একখানি গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে গিরীন্দ্রকুমার একটি সুন্দর চিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাহার নিম্নদেশে একটি কোট প্যান্ট পরিহিত কৃষ্ণকায় ব্যক্তি (কবি) নেশায় বিভোর হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, নিকটে পানাধার ও পানপাত্র এবং সেই নিদ্রিতপ্রায় কবির মস্তকের নিকট বাগ্‌দেবী অ াসিয়া কল্পনার আলোকরশ্মি প্রেরণ করিতেছেন। শুনিয়াছি, মাইকেল স্বয়ং এই চিত্র সন্দর্শন করিয়া চিত্রকরের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।' ১২৭৬ সালে ছাপা কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রচ্ছদ ছিল মোটা কাগজে ছাপা --- এক কথায় Paperback, স্ট্যানহোফ্ যন্ত্রে মুদ্রিত এই প্রচ্ছদের মধ্যে মাইকেলের নিজস্ব সীল লক্ষণীয়।

।। ৭ ।।

প্রচ্ছদ কী? কী প্রয়োজন? কখনই বা প্রচ্ছদ হবে? সেই প্রচ্ছদের বক্তব্য কী? প্রচ্ছদ কি কোন একটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জনমানসচক্ষে ভাবনার স্থান দেবে? Oliver Simon --এর Introduction to Typography -বই -এর একটি অধ্যায় হল Paper, Press work, Binding & Jacket, যেখানে বলা হচ্ছে

THE BOOK-JACKET

The last stage of book production is the Book-jacket. Although extraneous to the book as a whole, it demands the most careful and ingenious treatment. Originally the purpose was mainly protective, but in the course of time it has acquired a potent 'sales' value in addition to its function of supplying in miniature poster form relevant information of title, name of author and publisher. Most books are, as a matter of course, displayed for sale in bookshops both in this country and through export abroad. The book-jacket should appeal to prospective buyers at a first impression, and when there are books displayed of a similar kind but issued by different publishers, the excellence of the jacket will play a competitive part.

The approach to designing a book-jacket is more simple in some kinds of books than others. Books on more scholarly and specialized subjects, which do not lend themselves to ordinary methods of salesmanship, can well have jackets in a typographic style tending to harmonize with the typography of the book itself. Again, jackets for a standard library such as Everyman, where new titles are added from year to year, must have a recognizable style which will remain inviting over a long period. It is in the more general and highly competitive field that the jacket presents its greatest demand for novelty and difference from its fellows. Great variety can, of course, be achieved by employing different processes for different kinds of designs. Where work has been specially commissioned from artists, lithography, four-colour half-tone work, and the line-block (in colours or black only) may be used for reproduction, the choice of any one of these processess will depend on the nature of the original design. When a photograph is to be reproduced, either a half-tone block, photo, offset, or photogravure is necessary.

The most economic and not the least effective is the purely typrographic jacket. Typefounders offer a large number of display borders and faces of the requisite weight and carrying power for

the setting of jackets. By the skillful use of this wealth of material, it should be possible to achieve effects which will at the same time attract the attention of buyers standing some distance from the bookshop window or shelf, and yet be agreeable when the book is actually in the hand. We should not infer that all jackets should be bold in their type-setting; on the contrary, variety is essential, and this can be achieved in many ways by displays ranging from the simple to the ornate, in conjunction with variety in colour of inks and colour of papers. Many publishers produce books with certain similarities of style running through the jacket designs of most of their publications with the object of making their own publications recognizable by the book-buying public.

When publisher and printer are able to work exceptionally closely together, it is possible to assist the display by the kind of wording or 'blurb' supplied. This blurb may at times be an integral part of the typographic design on the front of a jacket, supplementary to the displayed words of title and author. The spine of a jacket, although narrow in relation to the side, should not be neglected; many books are displayed showing their spines only. When the area is sufficient for a continuation of an attractive display, the opportunity should not be neglected.

সামান্য কয়েকটি বক্তব্য থেকেই প্রচ্ছদ সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মিলে যায়। প্রচ্ছদ যে কী ভাবে আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে যায়, যা দিয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে মনে করিয়ে দেয়, তার এক উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের বই--বালি রঙের কাগজে ছাপা মলাট, তাতে রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে বই-এর নাম, নীচে রবীন্দ্র স্বাক্ষর--এক পলকে মনে পড়িয়ে দেয় বিশ্বভারতী প্রক াশনালয়ের কথা। বাংলা বই-এর এত মার্জিত অথচ সাধারণ প্রচ্ছদ মনে হয় এর আগে কখনও হয়নি। প্রচ্ছদে শুধু ছাপার হরফের ব্যবহারে, প্রধানত সোনার জলে লেখা ১৩১৬ (১৯০৯) সালে ছাপা একটি বিখ্যাত বই শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুদীর দোকান'। যে বই-এর প্রচ্ছদে তুঁতে রঙের কাপড়ের উপর ব্লক প্রিন্টিং-এ ছাপা 'মুদীর দোকান'-এর অক্ষর দেখলে এক নজরে ভুল হয়, দোকানের সাইনবোর্ড বলে। আর লেখকের নাম স্বাক্ষর-এর প্রতিরূপ। যদিও অপ্রাসঙ্গিক তবুও একথা জানানোর লোভ সংবরণ করা খুবই মুস্কিল যে মনে হয় পৃথিবীতে এটাই সর্বপ্রথম বই যে-বইতে পাতা জোড়া হলদে রঙের ফুলকো লুচির ছবি ছাপা হয়েছে। এই ধরনের দু-একটি সোনার জলে emboss করা প্রচ্ছদের নাম করি,
১৯২১-এ ছাপা 'মোগল বিদুষী'--ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, যার প্রচ্ছদে শুধু বই-এর নাম আর নীচের ডানদিকে মোসলেম প্রিন্টিং এবং পাবলিশিং কোং এর ছাপ চিহ্ন দেওয়া---লেখকের নাম মলাটে নেই। আবার "রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর" প্রণীত 'সধবার একাদশী' গ্রন্থের প্রচ্ছদে সোনার জলে বই/লেখকের নাম ছাড়া বই-এর সিরিজের নামও লেখা---"ত্রিকালীন গ্রন্থরাজির প্রথম গ্রন্থ"। গুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে ছাপা কোন বই -এ ঈষৎ রঙিন ক াগজের বা রেক্সিন-এর উপরে সোনালী রঙে ছাপা লেখকের নাম আর বই-এর নাম দেখলেই বলে দেওয়া যেত যে লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বই -এর প্রচ্ছদে কোন ছবি নয় অথচ শুধু ছাপার অক্ষরের ব্যবহার এবং বইয়ের সিরিজের নাম ব্যবহারে আর এক অমূল্য বই ঋষিকেশ সিরিজে সত্যচরণ লাহার ১৯২১-এ ছাপা 'পাখীর কথা'। গাঢ় নীল রঙের ক াপড়ের উপর সোনালি ব্লকে লেখা। তবে সবক্ষেত্রেই ব্লকে ছাপা হত অথবা emboss করে ছাপা হত। ছবির
ক্ষেত্রে এই সময় wood block বা copper block এ লাইন ড্রয়িংয়ে ছাপা হত। আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল যে এত যে বই ছাপা
হচ্ছে, নয়নমুগ্ধকর প্রচ্ছদ হচ্ছে, প্রচ্ছদের জন্য আলাদা করে অক্ষর তৈরি বা ছবি আকাঁ হলেও, সেই প্রচ্ছদ বা প্রচ্ছদস ম্পর্কিত ভাবনা কে করছে, কার মস্তিষ্কপ্রসুত বা প্রচ্ছদ শিল্পী কে তা জানার কোন উপায় ছিল না, প্রচ্ছদ শিল্পীর কোন রকম নাম উল্লেখ হয়তো তখনকার প্রকাশক বা লেখকের উল্লেখযোগ্য বলে মনে হত না। অথচ প্রচ্ছদের ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য ছিল।

বটতলার বই-এর প্রচ্ছদে কাঠ খোদাই ছবি ছাপা চলতে থাকলেও বটতলার বাইরের বইয়ে এর প্রচলন ক্রমশ কমতে থাকে। ছাপা শু হতে থাকে লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে এবং সম্পূর্ণ রঙিন হয়েও। লিথোগ্রাফে ছবি ছাপার ব্যাপারে তখন সব থেকে বেশি নাম ছিল গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের শিল্পীদের, যাদের মধ্যে অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর নাম না করলেই নয়। তবে লিথোগ্রাফে ছাপা যে তিনটি অতি দুর্লভ বইয়ের নাম করতেই হয় সেগুলি হল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ব্যঙ্গাত্মক ছবির বইগুলি। ১৯১৭-তে কলকাতার বিচিত্রা প্রেসে ছাপা 'অদ্ভুতলোক' বইয়ের প্রচ্ছদে গগনেন্দ্রনাথের কার্টুনের কবি। এক রঙা ছবি, উদ্ধত হাতুড়ি হাতে দিয়ে আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টা যেন নিজের পাশবিক রূপের পরিচয় দেয় তার প্রমাণ যে পিছনের কালো মস্ত বড় ভয়ার্ত ছায়া। বই-এর নামের অক্ষরবিন্যাস খানিকটা মায়াবী রূপের এবং ইংরাজী অনুবাদে নাম দেখা যায়। এক কোণে বিচিত্রা প্রেসের চিহ্ন জানান দেয় প্রচ্ছদ কোথায় ছাপা এবং সমস্ত লিথোগ্রাফারের নাম নিচে ছাপা 'Lithographed by Hari Ch. Mandal'। বাকি দুটি বই 'বিরূপ বজ্র' এবং 'নব হুল্লোড়'। এর মধ্যে 'নব হুল্লোড়' বইটির প্রচ্ছদে মজা হচ্ছে সম্পূর্ণ রঙিন Lithograph -এ Thacker Spink & Co থেকে ছাপা একটি
মুখাবয়ব বা প্রতিকৃতির ছবি। চার রঙে ছাপা এই বইয়ের প্রচ্ছদে বইয়ের দাম ছাপা হয়েছে। বটতলা অথবা বটতলার বাইরের বইয়ে লিথোগ্রাফে ছবি বা মলাট ছাপা হতে থাকলেও তখনকার কলকাতায় বৈদ্যুতিক শক্তি আসার ফলে চিৎপুরের কাঠখোদাই শিল্পীরা 'ইলেকট্রোটাইপ' নামে এক নতুন কায়দায় ব্লক তৈরি ছাপতে আরম্ভ করে। কাঠখোদাই ও ধাতুর (কপার) প্লেট খোদাই করে লেটারিং করা বা ছবি ছাপা সর্বত্র সমান মানের বা উচ্চমানের হত না। আবার এই পদ্ধতিতে সময়ও বেশি লাগত। ফলে মানুষ বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে শু করে দেয় ছাপার পদ্ধতির উন্নতি নিয়ে। এই সময়ই ১৮৯৭ সালে হাফটোন ব্লকের আবিষ্কার, ব্যবহারের প্রণালী তৈরি হয় যার সাফল্যের মূলে রয়েছে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর নাম— উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যিনি শিশুসাহিত্যিক হিসেবেই আমাদের জগতে পরিচিত, এবং এই পদ্ধতিতে ছাপার জগতে এক দাণ অগ্রগতির রূপ দেয় যার প্রকাশ প্রচ্ছদেও পড়তে শু করে। বাংলাদেশের মুদ্রণের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। লেখক, শিল্পী, সংগীতজ্ঞ একাধারে আবার অন্যদিকে মুদ্রণ বিষয়ে অসামান্য পারদর্শিতা — যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মূল্য পেয়েছে প্রধানত হাফটোন ছাপার ক্ষেত্রে। সেই উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম উল্লেখযোগ্য বই 'সেকালের কথা' বইটির প্রচ্ছদ ভাবনা, মুদ্রণ আজও অমলিন। প্রচ্ছদে সোনার জলে এমবস করে বইয়ের নাম, লাল রেক্সিনের উপর লেখা এবং কালো রঙে চাপা একটি আদিম প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী সমুদ্র থেকে উঁচু গলা বাড়িয়ে সোনার জলে এমবস করা টেরাডাকটিল ধরছে। একেবারে 'সেকালের কথা'রই যেন ক্যামেরায় তোলা ছবি। প্রচ্ছদ শিল্পীর নামের আদ্যক্ষর u. r. রয়েছে, ভারতমিহির যন্ত্রে, ২৫
নং রায়বাগান স্ট্রীট, সান্যাল এন্ড কোম্পানী থেকে মুদ্রিত হলেও প্রকাশকের নাম নেই। বইটাতে ১৭টি পূর্ণ পৃষ্ঠা হাফটোন ছবি আর ছোটছোট বহু ছবি এবং একটি দু-রঙে ছাপা মুখপত্রের ছবিও আছে। তৎকালীন বাংলার 'Derector of Public Instruction' বইটি
সম্বন্ধে বলেছিলেন 'I have no idea that such good illustration printing etc. could be done in Bengali'
। ১৯১০-এ ছাপা হল 'টুনটুনির বই' ২২ নং সুকিয়া স্ট্রীট, ইউ রায় অ্যান্ড সন্স থেকে প্রথম বই, অথচ প্রচ্ছদে ছিল একটি রঙিন হাফটোন ছবি যা উপেন্দ্রকিশোরের নিজের আঁকা। কী ছিল না সেই ছবিতে? বইয়ের নাম টুনটুনির বই নামাঙ্কন ছাড়াও ছিল বাঘ, শেয়াল, কুমির, গাছপালা, কান্না হাসি মুখের রঙিন ছবির সমাহার আর টুনটুনি পাখির একটা মিষ্টি ছবি। সত্যজিৎ রায় তাঁর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণায় বলছেন 'ইলাস্ট্রেটর হিসেবে উপেন্দ্রকিশোরের কাজে যে দক্ষতা ও রীতি বৈচিত্র্য দেখা যায় তার তুলনা ভারতবর্ষে নেই। ....' নিজের বই, সন্দেশ পত্রিকার সমস্ত ছবি এবং প্রচ্ছদের রঙিন ব্লক তিনি নিজেই করতেন তাছাড়া অন্যদের বইয়ের প্রচ্ছদও করেছেন। সীতা দেবীর 'হিন্দুস্থানী উপকথা'র রঙিন প্রচ্ছদটি তিন রঙা লাইন ড্রয়িং তাঁরই এমনকি মুখপত্রের রঙিন ছবি ও আরো ৩২টি হাফটোন ছবিও। তাই ভারতে ব্লকমেকিং শিল্পের ইতিহাসে সর্বাগ্রেই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে হয় পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোরকে। বাঙালি ব্লকমেকিং শিল্পে যে আজও শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছে সে যেন এই মানুষটির শিল্পীমন আর কল্যাণহস্তের ছোঁয়ার জোরেই।

১৯০৭-এ ছাপা হল বাংলার খোকা খুকুদের জন্য বই 'ঠাকুরমার ঝুলি' — গ্রন্থকার দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। প্রিয়গোপাল দাস নামে তৎকালীন স্বনামধন্য কাঠখোদাই শিল্পী এই বইয়ের ছবিগুলি এঁকে খোদাই করেছিলেন। গাঢ় নীল রঙের কাপড়ে বাঁধাই প্রচ্ছদে রূপোলি রঙে এমবস করা 'ঠাকুরমার ঝুলি' লেখা। অক্ষর শিল্প বা ক্যালিগ্রাফিক আদর্শের অক্ষর। প্রথম দর্শনেই আভিজাত্যের পরিচয় পাঠককে এনে দেয় বলে এ যেন আমাদের চির প্রবহমান সংস্কৃতিরই অঙ্গ।

১৯২১-এ ছাপা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুসি' বইয়ের প্রচ্ছদ, তিন রঙে ছাপা ব্লকে কিন্তু প্রচ্ছদে সেই পুরোনো ফ্রেম ব্যবহার — অথচ লেখকের নাম বা অন্য কোন তথ্যই নেই। ভিতরে প্রচ্ছদ রচয়িতার নামেরও উল্লেখ নেই।

।। ৯ ।।

ভারতীয় শিল্পে সামগ্রিক ভাবে পাশ্চাত্য ভাবনা ও রীতির সমস্ত প্রভাব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ দেশজ রীতিনীতি অনুসন্ধান এবং প্রয়োগ করে ছবি আঁকার সূত্রপাত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। তার প্রভাব এসে পড়ল প্রচ্ছদ শিল্পেও। 'রাজকাহিনী' (মেবার) প্রথম খণ্ড, ২৮শে জুন ১৯০৩-এ ছাপা। লাল কাপড়ের মলাটে সোনার জলে, ফার্সী অক্ষরের ছাঁদে বাংলায় 'র াজকাহিনী' লেখা। অক্ষর শিল্পের চরম নিদর্শন বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের হাতে। 'খাতাঞ্চির খাতা' ১৯২১-এ ইণ্ডিয়ান প াবলিশিং হাউস, কলকাতা থেকে প্রকাশিত) প্রচ্ছদপট অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত কাগজ ও মাটির পুতুল অনুসরণে। তবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছদ হল শ্রাবণ ১৩৪৮-ছাপা 'বুড়ো আংলা'র। কলকাতার এম সি সরকার থেকে ছ াপা, রঙিন, হাফটোন, লাইন মিশিয়ে অবনীন্দ্রনাথেরই আঁকা ছবিতে একটা পুতুল দেখা যায় যা আদ্রেঁ কার্পেলেস প্রেরিত সুইডেনের খড়ের পুতুল অবলম্বনে আঁকা। মজার ব্যাপার সুইডিশ লেখিকার বই 'Adventures of ত্বনপ্তব্দ'
অবনীন্দ্রনাথের বুড়ো আংলার প্রেরণা হলেও তা কিন্তু সম্পূর্ণ বাংলাদেশের বই, আবার প্রচ্ছদে খড়ের পুতুলের ব্যবহার /বিদেশী হলেও- দেশজ শিল্পের ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত। এই সব বই-এর প্রচ্ছদের বিন্যাস ভাবনা বা আঁকার ক্ষেত্রে উল্লেখযে াগ্য হল লেখকের নিজস্ব চিন্তার প্রয়োগ। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই লেখক, নিজেই শিল্পী এবং স্বচিত্রণে অনুরাগী। এবার আসা যাক তৎকালীন খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা প্রচ্ছদের কথায় যেখানে অন্য লেখকের বই -এর প্রচ্ছদ রচনায় তাঁরা হাত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -এর শারদোৎসব ১৯০৮ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত বইয়ের অলিভ সবুজ রঙের প্রচ্ছদের উপর সাদা রঙে মুদ্রিত, অনামী কোন শিল্পীর আঁকা উড়ন্ত হাঁস এবং তার নীচে একগুচ্ছ কাশফুল। গ্রন্থ ও লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিতে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ শিল্পীর কোনো নাম নেই কিন্তু ভিতরে উপেন্দ্রকিশোরের অ াঁকা একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। ১৯১২-তে ছাপা হল রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র -- এই বইয়ের প্রচ্ছদ শিল্পী এবার হলেন নন্দলাল। সবুজের উপর এমবস করে সোনার রঙে ছাপা হল একটি খসে পড়া পদ্মফুলের পাপড়ির ছবি।

১৮৮১ সালে প্রথম ছাপা 'বাল্মীকি' প্রতিভা'র প্রচ্ছদে ছিল তৎকালীন বিখ্যাত কাঠখোদাই শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ দেব অঙ্কিত সরস্বতীর ছবি। ত্রৈলোক্যনাথ দেব ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত ভারতীরও প্রচ্ছদ রচয়িতা। বাল্মীকি প্রতিভার মল াটের দ্বিতীয় ছবিটি কিন্তু ভারতীয় মলাটের ছবিরই প্রতিরূপ ছিল। তবে প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছিল না কিন্তু পুস্তকের নাম ও দাম অবশ্যই ছাপা ছিল।
১৯২৭-এ প্রকাশ পেল 'রক্তকরবী' প্রচ্ছদ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের নতুন আঙ্গিকের নাটকের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে গগনেন্দ্রনাথ আঁকলেন কিউবিজম ঘরানার অথচ ভারতীয় রীতিতে সাদা কালো আলো ছায়ায় ঠাস জ্যা মিতিক বুনোটে রক্তকরবীর একরঙা প্রচ্ছদ। কবির এই নাটক যে যক্ষপুরীকে নিয়ে রচিত সেই নগরীর চিত্ররূপই যেন প্রচ্ছদের বক্তব্য। গগনেন্দ্রনাথ অঙ্কিত এই প্রচ্ছদচিত্রের নিচে লেখা 'যক্ষপুরীর' রাজপ্রাসাদের জালাবরণ। চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।' রক্তকরবীর তৃতীয় সংস্করণ /বিশ্বভারতী, ১৩৫৭- প্রকাশিত হল গগনেন্দ্রনাথের রঙিন প্রচ্ছদ দিয়ে)প্রথম প্রচ্ছদের বদলে। গগনেন্দ্রনাথের শিল্প ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ এই কিউবিজম রীতির অঙ্কনমালায়, যা তৈরি করে দিয়েছিল ভারতীয় শিল্পে এক নতুন রীতির ধারা। বাস্তব ও কল্পনা মিশ্রিত আলো আঁধারে ক্ষেত্রবিন্যাস অথচ দুই

বিপরীতধর্মী বর্ণের ছন্দোময় সংঘাত, ত্রিমাত্রিক অথচ দ্বিমাত্রিক বিন্যাস পদ্ধতিতে, বিষয় সংস্থাপনের চূড়ান্ত ভারসাম্য আমাদের সত্যই মোহাবিষ্ট করে যক্ষপুরির অন্দরে নিয়ে যায়। ছবির রঙ, রেখা এবং বিন্যাসের কথা ভাবলেই দেখা যায় গগনেন্দ্রনাথ কত নিবিড়ভাবে চরিত্রের মানসিকতার সাথে মিলিত হয়ে এ-প্রচ্ছদচিত্র রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলালের করা রঙিন ছবি দিগন্ত বিস্তৃত বালুচরে দুটি উড়ন্ত হাঁসের ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ ছাপা হল জসীমউদ্দীন-এর কবিতার বই বালুচর, ১৯৩৭-এ। ভূমিকায় প্রথম লাইনেই কবি জাসীমউদ্দীন লিখছেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এই পুস্তকের প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়াছেন। বইটিতে নন্দলালের আঁকা ছবিটি আলাদা করে আঠা দিয়ে সাঁটা। উপরে ও নীচে লেটার প্রেসে ছাপা বইয়ের নাম ও লেখকের নাম। এইভাবে ছবি আলাদা করে ছেপে, তা মাপমত কেটে বাঁধানো বইয়ের মলাটে সেঁটে দিয়ে এক ধরনের প্রচ্ছদ দেখা যেত। কমলিনী সাহিত্য মন্দির-এর ১ সংস্করণ উপন্যাস সিরিজে এ ধরনের প্রচ্ছদ দেখা যেত। উল্লেখযোগ্য নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত গিনীর মালা-র প্রচ্ছদ। বহু রঙা প্রচ্ছদ, আলাদা করে Print করে Paste করা। প্রচ্ছদে একটি মালার ছবি এবং তা থেকে ১০টি
গিনির ছবি ঝুলছে। প্রত্যেকটি গিনিই হাত দিয়ে অনুভব করা যায়, ত্রিমাত্রিক ভাবে। এক ধরনের RaisedPrinting। সমগ্র প্রচ্ছদটির Background সোনালি রঙে ছাপা, অত্যন্ত আকর্ষণীয়, লোভনীয়। কিন্তু এ সব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম অজানাই রয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের ছাড়া নন্দলালের আঁকা অসামান্য প্রচ্ছদ চিত্র গুসদয় দত্তের 'ভজার বাঁশী' /১৩২৯- সেখানে বই-এর নামের লেটারিংয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যেন বাঁশীর সুরের ছড়িয়ে পড়ার মতোই লেখার অক্ষরগুলি ছড়িয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। ১৩৩৩-এ ছাপা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী') মাত্র এক রঙের ছাপা প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ভারতীয় ছবি নন্দলালের। 'পথের দাবী' নামের অক্ষরশিল্প এবং বিন্যাস অনেকটা বার্মিজ ধরনের। নীচে শরৎচন্দ্রের সই) লেখকের নামরূপে ব্যবহৃত। তবে 'পথের দাবীর' অক্ষরশিল্প কি নন্দলালের ? বিশ্বভারতী প্রকাশিত ১৩৩১-এর 'চয়নিকা') যেখানে হলদে কাগজের উপরে কালো দিয়ে ছাপা নন্দলালের আঁকা একটি সুষমামণ্ডিত গাছের ছবি মোটিফ হিসেবে ব্যবহৃত হল। এই ছবিই আবার গীতাঞ্জলি প্রচ্ছদে ব্যবহৃত। ছবির ব্লক একই রয়েছে, লেখকের নামও একই, শুধু বইয়ের নাম লেটার প্রেসে বদলে বদলে ছাপা হল। এই ভাবেই কোন গ্রন্থমালা বা সিরিজের বইয়ের পরিচিতি। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালায় প্রচ্ছদ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উড্‌কাট্ ছবি যা বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রচ্ছদ থেকে এসেছে। এই ধরনের প্রচ্ছদের বই দেখলেই চোখ বুঁজে বলে দেওয়া যেত যে এটা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার বই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের আঁকা ছবি দিয়ে বা নিজের করা অসামান্য মার্জিত অথচ বিপুল শিল্পসুষমা মণ্ডিত দুটি প্রচ্ছদ 'তাসের দেশ' /২য়, ১৩৪৫ বিশ্বভারতী- এবং 'চণ্ডালিকা' /প্রথম, ১৩৪০, বিশ্বভারতী-, মাত্র এক রঙে ছাপা এ প্রচ্ছদ। চণ্ডালিকাতে যদিও হাফটোন ব্লকের ব্যবহার হয়েছে। কালো রেক্সিনে বাঁধাই ১৩৩৯ সালে ছাপা 'পরিশেষ' বইয়ের প্রচ্ছদটির এক কোণায় বহুবর্ণে ছাপা রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে আঁকা পরিশেষ নাম এবং রবীন্দ্র অক্ষরটি এই বইয়ের মূল ভাবনা পরিস্ফুট করে। এখানেও ছবিটি আলাদা করে ছেপে, সেঁটে দেওয়া। এএক জাপানী স্টাইলের প্রভাব। বইয়ের প্রচ্ছদে অনকেটা কালো অংশের সামঞ্জস্যের সঙ্গে ছবির সৌন্দর্য লক্ষণীয়। আবার শুধু অক্ষর শিল্পকে নির্ভর করে রবীন্দ্রকৃত প্রচ্ছদ দুই বোন। যেখানে দুই বোন লেখাটির বিন্যাস যেন দুই সখীকে হাত ধরাধরি করে কাছে এনে রেখেছে স্নিগ্ধ স্নেহের বাঁধনে।

।।১০ ।।

১৩৩২ বঙ্গাব্দ, প্রকাশিত হল কলিকাতা ৭০ নং কলুটোলা স্ট্রীট হিতবাদী স্টীম মেসিন যন্ত্রে শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত এক মজার আকৃতি বই। লেখক, না লেখকের নামের বদলে নামপত্রে লেখা ভেণ্ডার শ্রী শরচচন্দ্র পণ্ডিত। বইয়ের নাম বোতল পুরাণ। সমগ্র বইটার আকৃতিই ছিল মদের বোতলের মত। এরকম ভাবেই কেটে করা হয়েছিল জনসাধারণকে অ

াকৃষ্ট করার জন্য। বোতলের গায়ে লেবেলের জায়গায় লেখা দাদাঠাকুরের বোতল পুরাণ। মাথায় ছিপির জায়গায় সে ানালি রঙে রঞ্জিত। এ এক নতুন ধরনের পরীক্ষা। বই -এর আকৃতি এবং মলাটের জন্য বইয়ের অন্যরকম মলাট বা বাঁধ ানো এমনকি বই-এর সাধারণ মাপের হেরফের ঘটিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এক সময় কম হয়নি। বর্তমানেও হয়ে চলেছে তবে এসব ক্ষেত্র অনেক খরচসাপেক্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং থেকে ছ াপা 'সাগর থেকে ফেরা।' তিন রঙা লাইনে ব্লকে ছাপা যেখানে মলাটের সমস্ত জমিতে অন্য সব রঙ ছাপিয়ে ডানা বিস্তৃত উড়ন্ত পাখির সাদা ছবি খুসির আনন্দে সাগরের উপরে ধরা দেয়। কিন্তু এর প্রধান মুন্সিয়ানা বাঁধানোর মধ্যে। FlatCoverFile-এর মত ধারের দিকে ফিতে দিয়ে বাক্স করে বাঁধা এ বই। ফিতে খুলে বাক্স থেকে বার করে পড়তে হয়। এই বইয়ের প্রচ্ছদ শিল্পী অজিত গুপ্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড বই মাত্রই হাতে ধরে বলে দেওয়া যেত প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা অজিত গুপ্তর। এইভাবেই কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রকাশনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যায় প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্য এক বই অথবা কিন্নর /আষাঢ় ১৩৭২, এম সিসরকার এন্ড সন্স- এর বাঁধানো বা মলাটের ভাবনা মনে রাখার মতে া। একই মলাটকে দু-আধখানা করা। বইয়ের দুদিকে ডালা খোলার মতো খুলতে হয়। অথচ যখন বন্ধ হয় বইটি তখন উপর উপর পড়ে দু-মলাট একই মলাটের চেহারা নেয়। দু-মলাটের আলাদা আলাদা ছবি মুহূর্তেই এক হয়ে ওঠে। মাত্র দু-রঙে ছাপা এই মলাটের শিল্পীও অজিত গুপ্ত।

বই বাঁধানোর কায়দা বা নিয়ম অনেক সময় ব্যতিক্রম হয়েও সৃষ্টি করে নতুন ধরনের মলাটের। ভালভাবে প্রথম প্রকাশিত মলাট সযত্নে রেখে পুরোনো বই যে কি ভাল ভাবে রাখা হয় তার উদাহরণ নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অনেক লেখাতেই জানা য ায়। এ এক ধরনের সন্তানবৎ ভালবাসার প্রকাশ।

।।১১ ।।

এবার চলে আসা যাক অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল সকলের অঙ্কন রীতি এবং অলংকরণের ধারার বিপরীতধর্মী অথচ স্বকীয়তার জাজ্বল্যমান চিহ্স্পর্শে মৌলিক সৃজন ভাবনার ছোঁয়ার এক শিল্পীর কথায়। যাঁর পরিচয় চিত্রশিল্পীর ভুবনে দেশজ মাটির স্পর্শের ব্যবহারে, লৌকিক শিল্পে ভাষার ছন্দের ব্যবহারে ঝিজোড়া খ্যাতি)সেই যামিনী রায়-কৃত প্রচ্ছদের সব থেকে বড়বৈশিষ্ট্য হল ভাবনা কখনই বিষয়মুখী নয়। প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনালেখ্য, উপন্যাস সব ধরনের প্রচ্ছদেই দেখা যায় তাঁর নিজস্ব রীতি বা স্টাইলের সুনিপুণ, অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত, মার্জিত রঙের ব্যবহার। দেশজ শিল্পের প্রতিমার রূপকল্প এবং আলপনার সমন্বয়। খুবই সামান্য রঙে, এক বা দু-রঙা ব্লকে ছাপা এই সব প্রচ্ছদ। অমিয় চত্রবর্তীর 'অন্নদা' সুধীন দত্তের 'উত্তর ফাল্গুনী', বুদ্ধদেব বসুর 'কালের পুতুল' উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছদ চিত্র। অপর্ণা দেবীর 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' দু-রঙে ছাপা, লৌকিক আলপনার সাদা রঙের ব্যবহার এবং যামিনী রায়ের হস্তলিপিতে বইয়ের নাম ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। আর ১৯৪৬-এ বুদ্ধদেব বসুর 'কালের পুতুল'-এর গ্রন্থ উৎসর্গে শিল্পীর প্রতি কবির ভাবনা ফুটে উঠে' শিল্পী য ামিনী রায়কে। চিত্রকলার আলোচনায় আমার অধিকার নেই, তাই আপনার প্রতি আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম এ বই আপনাকে উৎসর্গ করেই। তবে শিল্পী যামিনী রায়ের প্রচ্ছদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে বিষ্ণু দের কাব্যগ্রন্থের সিংহভাগে। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদের সৃষ্টির অনুভবী ভাবনা, আন্তরিকতার ছোঁয়াই প্রমাণ করে শিশুদের প্রতি, তার কাব্যের প্রতি তীব্র ভালবাসার নাড়ীর টান। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' /১৩৭০-, 'হে বিদেশী ফুল' /১৩৬০-, 'পূর্বলেখ' /১৯৪২-, ' তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ /১৩৬৫-, প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে নিজস্ব স্টাইল, নিজেই তুলি দিয়ে এঁকে দেওয় া গ্রন্থনাম যেন মুহূর্তেই হয়ে ওঠে ছবির অন্তর্ভুক্ত। বিষ্ণু দে অনূদিত মাত্র এক রঙে, হলদে কাগজের উপর ছাপা 'মাও সে তুং-এর আঠারোটি কবিতা' /১৯৫৮)র অনুবাদের প্রচ্ছদ যে তাদের যুগলবন্দীতে হয়ে উঠে এক প্রথামুক্ত বিশিষ্ট রীতির ঘরানা। গ্রন্থ প্রচ্ছদ চিত্রণে বিষ্ণু দে-কে লেখা শিল্পী যামিনী রায়ের ২০.৪.৬৩-তে লেখা একটা চিঠির উল্লেখ করলে অ ামরা দেখব সৃজনশীলতার আলোকে অকপট স্বীকারোক্তি তাঁর চিন্তার প্রমাণ।
শ্রীশ্রীহরি
২০/৪/৬৩

পরম প্রিয়বরেষু—
স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত বইখানি প্রবন্ধ কিছু ও কবিতাও কিছু— না পুরা কবিতায় লেখা জানালে ভাল হয়। উপরের রূপটির জন্য ভাবছি, শুধু হাল্কা ইণ্ডিয়ান রেড— কিম্বা দুটী রংএর করব— কিনা ভাবছি বেশী রং ব্যবহার করলে ব্লক করতেও খরচ বড্ড বেশী, যাই হোক যে টুকু জানতে চেয়েছি— জানালেই হবে। আগামী কালই পাবেন ছবিটা— আশাকরি সকলে ভাল আছেন। শুভকামনা জানাচ্চি। ইতি
আপনার যামিনীদাদা

।।১২ ।।

প্রচ্ছদে শুধুমাত্র অক্ষর শিল্প বা ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার লক্ষণীয় চিত্রকরবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাজের মধ্যে। ধাতব তীক্ষ্ণতা সূক্ষতার সীমা ছাড়িয়ে প্রাচ্য ক্যালিগ্রাফি রীতির ছন্দকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন ব্রাশের অথবা তুলির আঁচড়ে প্রচ্ছদলিপিতে। এতেপ্রচ্ছদ প্রথম দর্শনে নিরাভরণ মনে হলেও পরে এর নান্দনিক অথচ ছন্দোবদ্ধ অভিব্যক্তি প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। অজিত চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ', অমিতাভ চৌধুরীর 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ', রাণী চন্দের 'পূর্ণ কুম্ভ', অবনীন্দ্রনাথের 'পথে বিপথে' এমনকি বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রচ্ছদের মাত্র এক রঙা ক্যালিগ্রাফ লক্ষণীয়। অত্যন্ত কম খরচ স াপেক্ষ, লাইন ব্লক অথচ রেখার সম্ভাবনাময় গতির প্রকৃত ব্যবহার তিনি তাঁর চিত্র রচনার মতোই প্রচ্ছদের অক্ষর শিল্পের বিন্যাসে ব্যবহার করেছেন। এই ক্যালিগ্রাফির ছোঁয়া ও ভাবনা পরবর্তীকালে অনেক বিখ্যাত প্রচ্ছদ শিল্পীর কাজের অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

প্রচ্ছদের নামলিপিতে অক্ষরের ব্যবহার, সেটা প্রচ্ছদেই ব্যবহৃত চিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, চিত্রের যেন আবশ্যিক অংশ করে তুলে দিয়েছিলেন চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদার তাঁর ঋতু সংহার /১৩৫১, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ- বইয়ে। ম াত্র দু-রঙে ছাপা, সাদা কাপড়ের উপর কালো মেঘের মধ্যে ঋতু সংহার লেখা যা মনে করিয়ে দেয় ভাসমান মেঘের খেল া। লক্ষণীয় প্রচ্ছদে সোনালি রঙের ব্যবহার। লাইন ব্লকে ছাপা এক সময়ে এই ইণ্ডিয়ান প্রেসের /এলাহাবাদ- বইয়ের শুধু প্রচ্ছদের ছাপা দেখলে ভাবা যেত যে প্রকাশকের দৃষ্টি কত সুদূরপ্রসারী হলে তবেই এ কাজ হয়। শিল্পীর ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে প্রকাশকের চিবোধের পরিচয়ও।

।।১৩ ।।
বিখ্যাত শিল্পীরা ছাড়াও শুধুমাত্র প্রচ্ছদ শিল্পের জন্য এবং গ্রন্থ চিত্রণের জন্য যাঁদের দান অনস্বীকার্য তাঁদের মধ্যে পূর্ণ চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ /পি ঘোষ-, প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রকুমার সেন, সূর্য রায়, সুবোধ দাশগুপ্তের কাজ এবং প্রচ্ছদ ভাবনা মনে রাখার মতো। রাজশেখর বসুর বইয়ের প্রচ্ছদ বা ছবি যাই হোক না কেন, যতীন সেন-এর কাজ ছাড়া ভাবাই যেত না। সবই লাইন ব্লক এক রঙা বা দু-রঙে ছাপা। শিল্পীগু অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র বাংলা পত্র পত্রিকা এবং গ্রন্থ প্রকাশনার জগতে শুধু প্রচ্ছদ-শিল্পী হিসেবে এই সময়ে /১৯৩৫-১৯৫০- আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অসংখ্য বাংলা উপন্যাস, গল্প, শিশুপাঠ্য বইয়ের প্রচ্ছদ তিনি এঁকেছিলেন। 'মিত্র ও ঘোষ'-এর প্রায় অধিকাংশ বইয়ের প্রচ্ছদেই এঁর হাতের ছোঁয়া। বিভূতিভূষণ-এর 'আরণ্যক'- এ অরণ্যের হাতছানি দিয়ে ডাকা কলো আর সোনা লি রঙের প্রচ্ছদও এঁরই সৃষ্টি।

দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশিত প্রতি বছরের শারদীয়া সংখ্যায় মজাদার রঙিন প্রচ্ছদ আঁকতেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। সম্পূর্ণ রঙিন, লাইন ব্লকে ছাপা এই শারদীয়া এক ঝলকে ছোটদের মন কেড়ে নিত। এই বইগুলোর এক অন্য মজা ছিল পুট বা spine। যেখানে কাপড়ে বাঁধাই spineথাকত চার রঙে ছাপা ছবি এবং বইয়ের নাম। কাপড়ে ব্লকে সম্ভবত শাড়ী ছাপার পদ্ধতিতে ছাপা হত। তারপর কেটে আলাদা করে বই বাঁধানোর সময় ব্যবহৃত হত। এই বইগুলোর

বোর্ড বাঁধাইয়ের উপর ছবি ছেপে বাঁধাই ছাড়াও থাকত একটা আলগা মলাট বা Jacket। সেটাও রঙিন তবে বোর্ডের ছবির থেকে আলাদা। অর্থাৎ দু-ভাবে মলাট পাওয়া যেত।

।। ১৪ ।।

হাফটোন ব্লক এবং লাইন ব্লকে সম্পূর্ণ রঙিন প্রচ্ছদ এবং বইয়ের সমস্ত ছবি ও ছড়া করে যিনি শিশুরাজ্যের মন কেড়ে নিয়েছিলেন, তিনি সুকুমার রায়। ১৯২৩-এ ছাপা আবোল তাবোল-এর মলাটের ছবি বলতে গেলে এখন এরকম ইতিহ াসেই হয়ে গেছে। সুকুমারের ছাপার কলাকৌশলের উন্নতি সাধনের চিন্তা, বাংলা অক্ষরের ব্লক, বিভিন্ন Type faceতৈরির ভাবনা বাংলাদেশে ছাপার কারিকুরির

দিককে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী করেছিল। হিতেন্দ্রমোহন বসুর অঙ্কিত প্রচ্ছদ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভুবনমোহন রায় প্রণীত সুন্দরবনে সাত বৎসর হাফটোন ব্লকে বহুরঙা প্রচ্ছদ। লক্ষণীয় প্রচ্ছদের চারদিকে সাদা জমি ছেড়ে দিয়ে মাঝখানে গোলাকার শিকারের ছবি যেন বন্দুকের নল দিয়ে টার্গেট করা এবং বাঘ ও সাপের লড়াইয়ের জীবন্ত চিত্র। বইয়ের নাম ও লেখকের নামের আলাদা করে Type face তৈরি করে ছাপা হয়েছে।

শিবরাম চক্রবর্তী মানেই শৈল চক্রবর্তীর ছবি, প্রচ্ছদ তো বটেই তবে দু-রঙা বা তিন রঙা ব্লকে ছাপা শৈল চক্রবর্তীর হাতের অক্ষরে বইয়ের নাম ছাড়া ভাবাই যেত না। তবে শিবরামের কবিতার বই ১৯২৯ সালে এম. সি. সরকার থেকে ছাপা ‘চুম্বন’-এ দেখা গেল এক রঙা হাফটোন ব্লকে ছাপা বিখ্যাত শিল্পী রঁদার ভাস্কর্য ‘The Kiss’ছবির ব্যবহার। বোর্ডে বাঁধানো এই বইয়ের প্রচ্ছদে ছবিটা ছোট করে

ছেপে, কেটে মারা। বই-এর ভেতরে Printer’s Page শিবরামের অন্য এক বই-এর বিজ্ঞাপন রয়েছে ‘এই কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা

সংগ্রহ “মানুষ”......... অত্যুৎকৃষ্ট য়্যান্টিকে কুন্তলীন প্রেসে অতি সুন্দর ছাপা। প্রচ্ছদপটে রোদাঁর ছবি।’......... বাঙালি প াঠকের কাছে কবিতার বই-এর বিজ্ঞাপন) প্রচ্ছদের সৌন্দর্যময়তার আবেদনের মাধ্যমে। আবার নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত প াঠশালা পত্রিকার ১ম বর্ষ /১৩৪৫- একাদশ সংখ্যায় দেখা গেল বিজ্ঞাপন

চিত্র-প্রতিযোগিতা

পুরস্কার পঁচিশ টাকা

দেশের সমস্ত তণ শিল্পীদের আমরা আহ্বান করছি আগামী ২৫শে শ্রাবণের মধ্যে নববর্ষের পাঠশালার জন্য একটি সুন্দর তিন-রঙা প্রচ্ছদপট এঁকে পাঠাতে। যাঁর এই প্রচ্ছদ-চিত্র আমাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হবে তিনি ২৫ টাকা পুরস্কার ও এক বৎসরের পাঠশালা বিনামূল্যে পাবেন।

কার্যাধ্যক্ষ

পাঠশালা

পাঠকদের কাছে এ এক অন্য আকর্ষণ সৃষ্টি করল। দ্বিতীয় বছর থেকে এই পত্রিকায় সেই পুরস্কৃত প্রচ্ছদই ছাপা হতে ল াগল।

।। ১৫ ।।

বিংশ শতাব্দীর দিকে যতই চলে আসতে থাকি একটা চিত্র পরিস্ফুট হতে থাকে। বইয়ে প্রচ্ছদ শিল্পীর নামের ব্যবহার এবং তাঁরা যথেষ্ট সম্মান দক্ষিণাও এর জন্য পেয়ে থাকতেন। এভাবে সৃষ্টি হল আলাদা করে এক প্রচ্ছদ অঙ্কন শিল্পী বা Book Designer গোষ্ঠী, যাঁরা

অনেক ক্ষেত্রে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই রকমই কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন সূর্য রায়, সমর দে, মাখন দত্তগুপ্ত, অন্নদা মুন্সী, রঘুনাথ গোস্বামী, রণেন আয়ন দত্ত, রথীন মৈত্র। আলাদাভাবে বিজ্ঞাপন জগতেও

এঁদের পরিচিতি ছিল। এঁরা তৎকালীন ছাপার সমস্ত আধুনিক কলাকৌশলকে আয়ত্তে এনে, নিজেদের সমস্ত ভাবনা-চিন্ত াকে কাজে লাগিয়ে প্রচ্ছদ রচনায় হাত দিতেন। ফলে প্রচ্ছদ পেত নান্দনিক মর্যাদা। উল্লেখ করা যাক কয়েকটি প্রচ্ছদের য ার থেকে কিছুটা ধারণা করা যাবে এঁদের কাজের। বিষ্ণু দের কবিতার বই সন্দীপের চর/১৩৪৫, দি বুকম্যান)য়ের উদ্বেল আবেগকে রূপ দেন রথীন মৈত্র মাত্র এক রঙা লাইন এবং হাফটোন ব্লকের ব্যবহারে। রণেন আয়ন দত্তের করা দু মলাট জোড়া 'তিতাস একটি নদীর নাম'য়ের প্রচ্ছদ যেন আদিগন্ত বিস্তৃত তিতাসের সৌন্দর্যময়তায় উজ্জ্বল প্রকাশ, মাখন দত্তগুপ্তের করা 'ধানকানা', রঘুনাথ গোস্বামীর করা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়-এর লেখা 'ত্রীতদাস ত্রীতদাসীর' ২য় সংস্করণের মলাট এঁদের বহু কাজের মধ্যে সামান্যতম উল্লেখ থাকল। যদিও এঁরা সকলেই বিজ্ঞাপন জগতে বিশিষ্ট প্রতিভাধর ছিলেন তবুও বইয়ের প্রচ্ছদেও স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রচ্ছদে ব্লক ব্যবহার করে দু-রঙ বা তিন রঙে সমস্ত জমি ভরাট করা অত্যন্ত বিমূর্তধর্মী কাজের জন্য পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়-এর নাম উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। প্রচ্ছদে এত বেশি Abstract ধর্মী কাজ ম াঝে মাঝে পাঠককেও ভাবিত করে তোলে। দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশ্বমেধের ঘোড়া-১ম সং, জীবনানন্দ দাশের মহ াপৃথিবী, উল্লেখযোগ্য কাজ।

বই-এর আকৃতি নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ ছিল না। বাংলায় ছোটদের জন্য প্রথম মিনি বই বার হল ১৯৬৭-তে রঘুনাথ গোস্বামীর চিন্তা ভাবনায়। সমস্ত বইটির প্রচ্ছদ থেকে ভিতরে ইলাসট্রেশন তাঁরই। তবে দেখার মতো ছিল এর ৮টি সেটের বক্স' এবং তার বাঁধানো ওমলাট। এরপর মিনি বইয়ের রাজত্বে কিছুদিন একা ছড়ি ঘুরিয়ে রাজা হয়ে রইলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। এই সব বইয়ের অসাধারণ সব ব্লকে ছাপা প্রচ্ছদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রঘুনাথ গোস্বামীর করা কমলকুমার মজুমদারের বই, ও. সি. গাঙ্গুলীর করা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লাল রজনীগন্ধা', শুভাপ্রসন্নের করা 'টারজান সরজান' এবং গণেশ পাইনের করা 'বিপ্লব ও রাজমোহন' বইয়ের প্রচ্ছদ।

বাংলা সাহিত্য জগতে ব্রাত্য অথচ যাঁর গদ্যভাষার রীতি এক নতুন আন্দোলনের ঝড় তুলেছিল, সেই কমলকুমার মজুমদ ারের করা নিজেরই বইয়ের প্রচ্ছদ তাঁর ভাষার মতোই আভিজাত্যের চমকে ভরপুর। 'নিমঅন্নপূর্ণা' বা 'গল্প সংগ্রহ'য়ের প্রচ্ছদে সবুজ এবং কালো মিশ্রিতরঙে হাফটোন এবং লাইন ব্লকের ব্যবহারে আঁকা নারীর মুখাবয়ব তাঁর বলিষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টির পরিচয় দেয়। আবার 'পানকৌড়ি' ও 'আইকমবাইকম নামের প্রচলিত লৌকিক ছড়া সংগ্রহের প্রচ্ছদে দেখা যায় দেশজ চিন্তাধারায় সৃষ্ট কাঠখোদাই ছবির অনুকরণ। অথচ আবার 'অন্তর্জলি' যাত্রা'র প্রচ্ছদে লাল রঙের ওপর সোনা লি রঙে কমলকুমারের নিজেরই হস্তাক্ষরের আদলে লেখা বই এবং লেখকের নাম নিজস্ব উজ্জ্বলতায় প্রথম দর্শনেই প াঠকের মন কেড়ে নেয়।

স্বামী-স্ত্রীর চিরন্তন সাংসারিক বন্ধন অথবা ভালবাসার নিবিড় আবেগময়তার রঙে সহধর্মিনী লীলা রায় এঁকে দিতেন অন্নদ াশঙ্কর রায়ের প্রায় সমস্ত বইয়েরই প্রচ্ছদ - যেখানে রঙের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত কম অথচ সুশ্রী মার্জিত।

।। ১৬ ।।

লাইন ব্লক, হাফটোন ব্লক, রঙিন ব্লক, ফটো-লিথোগ্রাফি সমস্ত পদ্ধতিতে যত ছাপার উন্নতি এবং প্রসার হচ্ছে বিংশ শত াব্দীর যুগে তত আর এক ঘটনার প্রসার হচ্ছে যা হল চিত্রশিল্পীরা প্রচ্ছদ রচনার কাজে মনোনিবেশ করছেন। ফলে এই সমস্ত প্রচ্ছদ তাঁদের শিল্পকর্মের অন্য এক প্রয়োগক্ষেত্র হয়ে উঠেছে যার মূল্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অপরিসীম হয়ে থ াকবে।

প্রচ্ছদে বহু বর্ণের বিচিত্র ব্যবহার এবং নিজস্ব চিত্র রচনাকর্মের রীতির ব্যবহার দেখা গেল কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের আঁ াকা 'জগন্নাথের খেয়ালখাতা', 'আরও বিচিত্র কাহিনী' প্রভৃতি বই। শিবতোষ মুখোপাধ্যায়-এর লেখা রূপ লাবণ্যের বই লাবণ্যের অ্যানাটমিতে শুধু প্রচ্ছদ নয় ভিতরের চিত্র রচনাও তাঁর। প্রচ্ছদে ধুতরো ফুলের সঙ্গে গাউন পরিহিত মহিলার

রূপান্তরের অ্যানাটমি আকর্ষণীয়।

চিত্রশিল্পী অপেক্ষা 'ভাস্কর' বলতেই আমরা একডাকে চিনি যে রামকিঙ্করকে তাঁর করা 'দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতার সাদা জমিতে দু রঙে ছাপা ফুলের ভাস্কর্যমণ্ডিত ছবি উল্লেখযোগ্য। সংগ্রহে রাখবার মত এ প্রচ্ছদ। রামকিংকরের চিত্র ব্যবহার করে অন্য এক প্রচ্ছদ অমিতা সেনের বই 'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা'র।

প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় হাত দিয়েছেন তাঁরই নিজের লেখা বই 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ'-এর প্রচ্ছদ রচনায়। লাইন ব্লকে ছ াপা এই প্রচ্ছদ তাঁরই চিত্ররচনা ধর্মী।

ভাস্কর চিন্তামণি কর তাঁর বই 'সান্নিধ্য' /১৩৬৬)এর প্রচ্ছদ করেছেন মানবী মূর্তিকে ভাস্কর্যের আদলে রূপান্তরিত করে। প্রচ্ছদলিপিও হস্তাক্ষর সমন্বিত। আবার হালআমলের মুদ্রণে তাঁরই আঁকা ছবি ব্যবহার করে এবং কম্পিউটার নির্মিত ব াংলা অক্ষরে বইয়ের নাম স্মৃতি চিহিত-য়ের সৃষ্টি করেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর যুগলবন্দী কাব্য রচনা সুন্দর রহস্যময় গ্রন্থের প্রচ্ছদে রহস্যময়ী নারীর ম াত্র এক রঙা আকর্ষনীয় চিত্র ফুটে ওঠে নীরদ মজুমদারের তুলিতে। সুন্দর ও রহস্যময় দুই শব্দের সঙ্গে, দুই কবির কবিত ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ প্রচ্ছদ গুণবিচারে হয়ে ওঠে তাৎপর্যমন্ডিত।

ক্যালিগ্রাফিক রেখার বলিষ্ঠ অথচ অত্যন্ত সাবলীল ছন্দে মাত্র এক রঙে শিল্পি পরিতোষ সেনের হাতে ফুটে উঠে অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'মাসি'র প্রচ্ছদ। আলংকারিক রীতির পাশে সমান ছন্দে একই রেখায় গ্রন্থ নাম অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার নিজের লেখা বই 'আমসুন্দরী ও অন্যান্য রচনা'র প্রচ্ছদে আমসুন্দরীর লাল রঙের মুখ গ্রন্থের স্বাদের পরিচয় দেয়। এ গ্রন্থের প্রতিটি লেখাই রম্যরচনাধর্মী, ব্যঙ্গাত্মক। প্রচ্ছদে শিল্পের ব্যবহারে যে শিল্পী পরিতোষ সেন দক্ষ তা আবার প্রমাণ করে। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত /১৩৬১, বিশ্বভারতী- অতুলচন্দ্র গুপ্তের নদীপথের প্রচ্ছদ এবং সচিত্রকরণও করেন তিনি। প্রচ্ছদে সামান্য কয়েকটি রেখার সমাবেশে নৌকার চিত্রমালা মোহাবিষ্ট করে।

বিমূর্ত ধর্মী অথচ প্রতিটি অবয়ব নিজস্বতার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট আবার শিল্পীর সহজাত রীতিভঙ্গির গুণে পরিপুষ্ট প্রকাশ আব ার শুধু অক্ষর বিন্যাসে তাঁর দক্ষতার পরিচয় থেকে যায় অসীম রায়েব দেশদ্রোহী, শব্দের খাঁচায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের এক যে ছিল দেওয়ালের আবরণে। অক্ষর বিন্যাসের মধ্যেও প্রকাশের নিজস্ব অঙ্কন রীতি অনুভব করা যায়।

মৌলিক চিত্র অঙ্কন রীতিকে সরাসরি ব্যবহার করে, শিল্প সাদৃশ্য রেখার নির্মাণে প্রচ্ছদ অঙ্কনে হাত দেন শিল্পী যোগেন চৌধুরী। ছোট বড়অসংখ্য পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদ করেছেন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের ঘটনাপ্রবাহের মতোই তার হাঁ প্রিয়তমা গ্রন্থের প্রচ্ছদে প্রিয়তমাকে স্বকীয় রীতিসিদ্ধ আঙ্গিকে উপস্থাপনা করেন যোগেন চৌধুরী।

শিল্পী গণেশ পাইন - অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি সৃজনশীল চাশিল্পীদের পরবর্তী চিত্রভাবনার সার্থক উত্তরসুরী। যদিও তাঁর চিত্ররচনার বিপুল সম্ভারের মধ্যে গ্রন্থ অলংকরণ অথবা প্রচ্ছদ রচনার সংখ্যা খুবই সামান্য তবুও তাঁর সেই নির্মানে জড়িয়ে থাকে আন্তরিক ভাবনার শ্রমসাধ্য প্রকাশ। দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের পোলি মুকুটয়ের প্রচ্ছদের বাস্তবতার মধ্যে উজ্জ্বল আলো আঁধারী রঙে রেখার নানা সূক্ষ্ম বুনোটে সঞ্চিত রহস্য - যা গণেশ পাইন-এর চিত্ররচনার রীতির পরিচয় তার প্রমাণ মেলে। সম্পূর্ণ রঙিন এই প্রচ্ছদ গণেশ পাইনের অন্যান্য চিত্রকর্মের মতোই মূল্যবান। দেবর্ষি সারগী বা অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের প্রচ্ছদে জটিল আঙ্গিক বিন্যাস গ্রন্থের চরিত্র সন্ধানী হয়ে ওঠে অথচ শঙ্খ ঘোষের ছড়ার বইতে তাসের রাণীর বিস্ময়কর চাউনি রেখায় অঙ্কিত শিশুচরিত্র এবং ভেসে যাওয়া কাগজের নৌকার চিত্রকল্প ছড়ার সীম

া ছাড়িয়ে কল্পনার জগতে স্থান নেয়- মননের বীণাতে ঘোষণা করে সব কিছুতেই খেলনা হয় তা ভেবে দেখতে।

প্রচ্ছদ শিল্পে এক ব্যতিক্রমী ভাবনা শিল্পী হিরণ মিত্রের। তুলি অথবা ব্রাশের দৃঢ় টান টোনে প্রচ্ছদ ফুটে ওঠে। তাঁর নিজের বই 'আমার ছবি লেখা'তে মাত্র এক রঙে গাঢ় খয়েরী রঙের আড়াআড়ি লম্বাটে বইয়ের সাদা প্রচ্ছদে শুধু তুলির অ াচঁড়ে লেখা গ্রন্থনাম। হিরণ মিত্রের আর এক অসাধারণ শিল্পকর্ম দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় অনূদিত প্রিয়তম থিও, তোমার ভিনসেন্ট বইয়ের প্রচ্ছদে। ভ্যান গঘের মতোই সুদৃঢ় সরলরৈখিক মোটা তুলির ছোট ছোট টানে প্রতিকৃতি এবং ইংরা জিতে বড় মাপের লাল রঙে Vincent সইয়ের ব্যবহার এক অন্য মাত্রা এনে দেয়।

নিজস্ব শিল্পরীতির সার্থক প্রয়োগ দেখি কে. জি সুব্রহ্মণ্যনিয়মের করা প্রচ্ছদে। এই প্রচ্ছদের বক্তব্য গ্রন্থ-বক্তব্যের সঙ্গে যথ াযথ সামঞ্জস্যপূর্ণ, আবার শিল্পীর গ্রাফিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রও দু-রঙে ছাপা অথচ প্রায় একই রকমের রঙ ব্যবহার করে দুটি ভিন্ন বইয়ের প্রচ্ছদ করেছেন কে. জি সুব্রহ্মনিয়ম। শঙ্খ ঘোষের নির্মাণ আর সৃষ্টি /১৩৯৯, প্যাপিরাস-যার প্রচ্ছদে রাবীন্দ্রিক ধর্মী ডিজাইন, মধ্যে হাফটোনে ছাপা রামকিঙ্করের করা রবীন্দ্র ভার্স্কর্য বিরাজমান। এতে বইয়ের ন ামলিপি অবশ্য দেবব্রত ঘোষ কৃত এবং লেখকের নামের জায়গায় শঙ্খ ঘোষের স্বাক্ষর প্রতিরূপ। অন্য এক বই গায়ক রবীন্দ্রনাথ /আনন্দ- পার্থ বসুর। এখানেও রবীন্দ্র প্রতিকৃতির ব্যবহার তবে তা শিল্পির নিজেরই আঁকা, নাম লিপিও তাই। গায়কীর চিত্রকল্পরূপে ব্যবহৃত হয় একটি পাখি। রঙের ব্যবহার এবং গ্রাফিক শিল্পকর্মের SpaceDivision-এ চিন্তিত ব্যবহার আশান্বিত করে আমাদের, চিনিয়ে দেয় কে জি সুব্রহ্মনিয়মের আঁকার রীতিকে।

১৯৮৬ তে অন্বেষা প্রকাশিত অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস মহিষকুড়ার উপকথার প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন শ্যামল দত্ত র ায় যাঁর জলরঙে আঁকা ছবি আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় তাঁর চিত্ররচনার রীতিকে। শুধু কালো রঙে হাফটোন ব্লকের ব্যবহ ারে এই প্রচ্ছদে ভাঙা শিলালিপিতে যেন খোদাই হয়ে থাকে মহিষকুড়ার উপকথার ঘটনাবলি।

শুধুমাত্র জলরঙের শিল্পী হিসেবে পরিচিত শৈবাল ঘোষের অসামান্য শিল্পচেতনা রূপ পায় অরণি বসুর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'শুভেচ্ছা সফর' /এক রঙ- এবং 'লঘু মুর্হূত' /দু-রঙা- প্রচ্ছদে। জল রঙে বিভিন্ন Shade-এর বর্ণময় ব্যঞ্জনার প্রকাশ এই প্রচ্ছদ দুটি। বই দুটির নামলিপি কিন্তু লেখকের নিজের। শিল্পী এবং লেখকের মানসিকতার মেলবন্ধন ঘটে প্রচ্ছদে।

প্রচ্ছদে শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজের নামের আদ্যক্ষর অথবা স্বাক্ষর ব্যবহার করেছেন। বইয়ের Printer's Page নাম তো
আছেই কিন্তু ছদ্মনামে প্রচ্ছদ এঁকে, নামের আদ্যক্ষরকে প্রচ্ছদ চিত্রের সাথে মিশিয়ে দিয়ে তৈরি হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবন থেকেপ্রকাশিত কঙ্কাবতী শিল্পী a b এই নামে পরিচিত। আসল নাম ছিল অনিল ভট্টাচার্য। প্রধানত কমার্শিয় াল চিন্তার মূল ধারাই ছিল এঁর রচনার রীতি। এক রঙ বা দু-রঙে কম খরচেই প্রচ্ছদ চিত্র তৈরি হত।

।। ১৭ ।।
প্রচ্ছদ রচনার কাজে, সৃষ্টির কাজে এতদিনের সমস্ত ধ্যান ধারণাকে ভেঙে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিলেন তিন শিল্পী-খালেদ চৌধুরী, সত্যজিৎ রায় এবং পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রচ্ছদ শিল্পের জগতে মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, আলাদা জগৎ তৈরি করে দিলেন এঁরা। সাধারণ পাঠক ভাবতে শিখল, বুঝতে শিখল, দেখতে শিখল প্রচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা কী। সেই সঙ্গে তৈরি হল কয়েকটি প্রকাশনালয়ের যারা বাংলা বইয়ের মুদ্রণ সৌকর্য, বহিরঙ্গের আবরণ সৌন্দর্যের সম্পর্কের চিন্তার প্রসার, উপস্থাপনা ঘটাতে সাহায্য করলেন। এদের মধ্যে সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত /ডি. কে.- কে সর্বাধিক অগ্রগণ্য মহ াপুষের মতো বলা যায়। বাংলা বইয়ের সুষ্ঠু উপস্থাপনযোগ্য অন্যান্য প্রচ্ছদের জনকই বোধ করি এই ডি. কে. নামের ম ানুষটি। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য প্রকাশনালয় ছিল ত্রিবেণী প্রকাশন, নতুন সাহিত্য ভবন, ভারবি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুদীত হিউ টয়ের ‘ব্যাঘ্রকেতন’-এর দু-মলাটে জোড়া বাঘের গায়ের ছাপার মতো খালেদ চৌধুরীকৃত প্রচ্ছদ আজও অনেকেরই চোখে ভাসে। মহাশ্বেতা দেবী অনুদিত ‘জিম করবেট অমনিবাস’-এর প্রচ্ছদে আদিম গুহাচিত্রের শিকারের ছবি - যে খেলা আদিম তারই গল্পের মাঝখানে একটি বাঘের ছবি যেন সেই গল্পই শোনায়। আবার রাহুল সাংকৃত্যায়নের বিখ্যাত গ্রন্থ ভোলগা থেকে গঙ্গার প্রচ্ছদেও সেই সভ্যতার বিবর্তনের গুহা চিত্রের ছবি গ্রন্থ বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে। মহাশ্বেতা দেবীর হাজার চুরাশির মা, কবি বন্দ্যঘটীর প্রচ্ছদ অথবা প্রতিভা বসুর বইয়ের প্রচ্ছদে শাড়ির পাড়ের নকসা সেও খালেদ চৌধুরীকৃত। সারা জীবনে নাটকের মঞ্চ-নির্মাণ ছাড়া তাঁর সব থেকে বড় কাজ প্রচ্ছদ নির্মাণ। শম্ভু মিত্রের প্রথম বই ‘অভিনয় নাটক মঞ্চ’-র প্রচ্ছদ নির্মাতা খালেদ চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে মঞ্চমায়ার। খালেদ চৌধুরীর করা Calligraphy বা অক্ষরশিল্প পাঠকের চোখকে তৈরি করে দেয় এক মার্জিত চির শিল্পবোধের এবং স্টাইলের তৃপ্তি মিত্রের বলি, ইঁদুর, সুতরাংগ্রন্থের প্রচ্ছদে ‘বলি এর ‘ ি’-এর উপর অংশকে খাঁড়ার মত রূপ দেওয়া, গোপাল হালদারের আড্ডার মাত্রাছাড়া একসাথে জোড়া লেটারিং বই বক্তব্যের স্বাদ এনে দেয়। বই-এর বক্তব্যের অথবা তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রচ্ছদ ভাবনা খালেদ চৌধুরীর প্রতিটি শিল্পকর্মের মধ্যেই বর্তমান। সমস্ত জীবনে এত প্রচ্ছদ করেছেন যে তা সংখ্যায় ধরার কথা ভাবাই যায় না। জীবনের প্রথম প্রচ্ছদ আঁকার অভিজ্ঞতা কি রকম তাঁর কথাতেই তুলে ধরা যাক - ‘... এক ভদ্রলোক এসে আমাকে বললেন “আপনি তো আর্টিস্ট, আমাদের ম্যাগাজিনের জন্য একটা প্রচ্ছদ এঁকে দিন তো।” করে দিয়েছিলাম। পারিশ্রমিক পেয়েছিলাম দশ টাকা। ইন্টার ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস থেকে ডাইসন কাটারের বই-এর চিন্মোহন সেহানবীশের অনুবাদ সোভিয়েত দেশটাকে আমি স্টার হিসেবে সিম্বলাইজ করেছিলাম। প্রবলবেগে রকেটের মতো সেটা উপরে উঠছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানও যেন সেই একই ভাবে “রাইজ” করছে। এঁকে ফেলার পর মনে হয়েছিল, প্রচ্ছদ আঁকাই বোধহয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। এ উক্তির তাৎপর্য যে কোন প্রচ্ছদ শিল্পীর কাছেই অনেক গর্বের, অনেক শ্রদ্ধার, অনেক ভালবাসার। এক সময় খালেদ চৌধুরী সিনেমা এবং থিয়েটারের পোস্টারও এঁকেছেন। এই পোস্টারআঁকার ভাবনা কিভাবে তাঁকে প্রচ্ছদ রচনার ভাবনায় অনুপ্রাণিত করেছে, তা শোনা যাক তাঁরই ভাষায় - দুয়ের মধ্যে একটা মিল তো ছিলই। পোস্টারের মধ্যে একটা “জিস্ট” থাকত। নির্দিষ্ট পরিসরে পুরো একটা ঘটনাকে তুলে ধরতে হত। প্রচ্ছদেও তাই। ছোট একটা মলাটের মধ্যে বইয়ের গোটা নির্যাসকে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটা আমার কাছে একটা অবসেশনের মতো হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে টেকনিকটা রপ্ত ছিল না। অনেক সময়ই যেটা চেয়েছি করে উঠতে পারিনি। “হচ্ছে না” এই ভাবনাটা আমাকে কুরে কুরে খেত রাতে ঘুমোতে পারতাম না। ছটফট করতাম। অনেক সময় একটা বইয়ের জন্য আটটা দশটা লেআউট করেছি। হয়তো একটাও “অ্যাকসেপটেড” হয়নি। তবু করে যেতাম। টাকা পাচ্ছি না। দিনের পর দিন খাওয়া নেই, কিন্তু কখনও কারও কাছে কাজ চাইতে যাইনি। মনে আছে জীবনে মাত্র দুবার কাজ চেয়েছিলাম। একবার এক পাবলিশিং হাউসের কাছে। আর একবার বসুমতী কাগজের এক সাহিত্যিক- সাংবাদিকের কাছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলাম। তিনি কাজ তো দেনইনি উলটে বলেছিলেন, “যাকে তাকে দিয়ে কাজ করাই না।” খুব কষ্ট পেয়েছিলাম মনে হয়েছিল মানুষকে তো ভদ্রভাবেও না বলা যায়। অনেক পরে যখন আমার প্রচ্ছদ এঁকে একটু-আধটু নাম হয়েছে, ওই ভদ্রলোক তাঁর প্রকাশককে বলেছিলেন, আমাকে দিয়ে যেন তাঁর অমুক বইটার প্রচ্ছদ আঁকিয়ে নেওয়া হয়। অপমানটা ভুলতে পারিনি। প্রকাশককে বলেছিলাম, ওঁকে বলে দেবেন যার তার বইয়ের প্রচ্ছদ আমি করি না।

অথচ সাহিত্য থেকে জীবনে কী পেয়েছেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন সময়ের অভাবে লেখা বা পড়ার অভ্যাস নেই এবং কবিতা নাকি কিছুই বোঝেন না। কোন এক কবির প্রশ্ন ‘আর্টের লোক হয়েও কবিতা বোঝেন না?’ এর উত্তরে তাঁর বক্তব্য জোর করে বোঝানো যায়না, এটা স্বতস্ফূর্ত ব্যাপার।’ তাহলে বইয়ের প্রচ্ছদে সৃষ্টি করেন কীভাবে? এর উত্তরে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি - সেটা তো যে রকম মনে হত, সে রকম করতাম। সত্যি বলছি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধআমার এখন আর বিশেষ পড়া হয়ে ওঠে না। উপন্যাস তো নয়ই। এত টাইম কনজিউমিং। আসলে আমি একদমই পড়ুয়া লোক নই। নাটক পড়েছি কিছু কিছু আর প্রবন্ধ। প্রচ্ছদ করতে গিয়ে আমার কিছু সাহিত্য পড়ার দুর্ভোগ হয়েছে এটুকু বলতে পারি। অধিক

াংশই বেশ খারাপ লাগত। প্রথম দিকে পুরো বইটা পড়ে তবে প্রচ্ছদ করতাম। শেষের দিকে মোটামুটি জিস্টটা শুনে নিতাম। সেই বুঝে করে দিতাম। একবার মজা হয়েছিল। চারশো পাতার একটা বই রাত জেগে পড়ে লে-আউট করে দেখাবার পর লেখক বললেন, "এটা ঠিক আমি চাইনি। আমি এই এই কথা বলতে চেয়েছিলাম।" আমি বললাম, কই বইতে তো কোথাও সেই ইঙ্গিত নেই। উনি উত্তর দিলেন, আসলে আমি ঠিক প্রকাশ করতে পারিনি। তখন বাধ্য হয়েই বললাম, আপনি চারশো পাতার বইয়ে যা প্রকাশ করতে পারেননি আমি এক পাতার প্রচ্ছদে তা কী করে পারব?
এও এক ট্র্যাজিক বিবৃতি। তবুও ভাবনায়, রেখায় এই মানুষটির চিন্তাধারা আমাদের আজও অতি গর্বের হয়ে আছে।

।। ১৮ ।।

সত্যজিৎ রায় - বাংলা অথবা বাঙালির কাছে নতুন করে তাঁর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় না তাঁর চলচিচত্র শিল্প বা সাহিত্যকীর্তি নিয়ে কোন আলোচনায় যাওয়ার। কিন্তু প্রথম জীবনে এই মানুষটি প্রচ্ছদ অঙ্কনে ও বই ইলাস্ট্রেশনে যে দক্ষতা যে ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন তা আমাদের গর্বের বিষয়। সমস্ত কর্মজীবনে প্রায় চারশোর কাছাকাছি বই, পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদ করেন তিনি। তাঁর এই বিপুল শিল্পকর্মের বিস্তৃতির পরিধি, ভাবনার মাত্রা এবং প্রয়োগ দেখলে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। প্রতিটি বইয়ের প্রচ্ছদ যেন প্রত্যেকেপ্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা রূপ, প্রতিটি প্রচ্ছদ যেন কথা বলছে, হয়ে উঠছে প্রাণবন্ত। তাঁর প্রচ্ছদের অভিনবত্ব তৎকালীন বাংলা বইয়ের জগতে এনে দিয়েছিল এক আলোড়ন। ডি কে গুপ্তর সিগনেট প্রেস /১৯৪৬- প্রকাশিত থেকে প্রায় অধিকাংশ বইয়ের প্রচ্ছদই তাঁরই রচনা। যেখানে সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, বই-এর ব্লকের পিছনে ব্যবহার, বইয়ের বাইন্ডিংয়ের Spine-এর ডিজাইন সবই ছিল অন্য ভাবনার এমন কি টাইটেল পেজ, ফলস টাইটেল পেজ, প্রতিটি পাতার লাইন, অক্ষরের মধ্যে ফাঁক সবই ছিল মানানসই, বিজ্ঞাপনও তাই। সিগনেট প্রেসের আগে পুলিনবিহারী সেনের নির্দেশনায় বিশ্বভারতীকে বাদ দিলে এরকম ব্যতিত্রমী প্রকাশক মেলা ভার।

শান্তিনিকেতনে নন্দলাল, বিনোদবিহারীর ছাত্র সত্যজিতের ক্যালিগ্রাফির প্রতি আগ্রহ স্বাভাবিক। জীবনের একটা মূল্যবান সময় তিনি এইঅক্ষর শিল্পের দিকে দিয়েছেন। অনেক বইয়ের মলাটে শুধুমাত্র অক্ষরশিল্পের ব্যবহারে গড়ে তুলেছেন অসামান্য সব শিল্পকর্ম যাতে বিনোদবিহারীর ছাপ লক্ষ করা যায়। ব্রাশ ড্রয়িং রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান তাঁর বিনোদবিহারী ধাঁচের ক্যালিগ্রাফির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আবার বাংলা অক্ষরের রূপ বদল করে যে নিদর্শন তিনি করেছেন তা অকল্পনীয়। তবে প্রতিটি বইয়ের প্রচ্ছদে ছিল বইয়ের মূল ভাবনার সরাসরি প্রতিফলন। প্রচ্ছদই বলে দিত বইয়ের বক্তব্য। সেই সঙ্গে ভেবেছেন কত কম রঙে সুষ্ঠু প্রচ্ছদ করা যায় - প্রকাশকের খরচের কথা ভেবেই। মাত্র এক রঙে ছাপা আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত সিগনেট থেকে প্রকাশিত পচিঁশ বছরের প্রেমের কবিতার লাল রঙের অক্ষরে লেখা প্রচ্ছদ মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। আবার সমর সেনের কবিতার লেটারিং সৃষ্টি করে অন্য এক ধারার এবং প্রচ্ছদে লেটারিংয়ের বিন্যাসে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তিন লাইন বা চার লাইনে সম্পূর্ণ বইয়ের নামকে ভেঙে দেন তিনি। ১৯৪০-এ এম সি সরকার থেকে ছাপা সুকুমার রায়ের বই পাগলা দাশুর প্রচ্ছদে মিচকে শয়তান পাগলা দাশুর মুখ আর দস্যিপনা মাখানো অক্ষরই বলে দেয় বইয়ের গল্পের বক্তব্য। সত্যজিতের অন্যতম সেরা প্রচ্ছদ ১৩৫০-এ সংকেত ভবন থেকে ছাপা কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ছাতুবাবুর ছাতা - ড্রয়িং-এর জাদু পুরোপুরি ফলিয়েছেন এ প্রচ্ছদে। মাত্র দু রঙে লাইন ব্লকে ছাপা প্রচ্ছদে কালো তুলিতে আঁকা ছাতুবাবু ছাতা মাথায় দিয়ে পিছন দিক ফিরে হেঁটে চলেছেন, বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। হাঁটার ভঙ্গি আর ছাতাই বলে দিচ্ছে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং গল্পে হাস্যরসের সমাহার। ইয়োলো আকারের একটি নক্সাওলা ভূমির মধ্যে ছাপা এ ছবি। নক্সাটাও গড়ে উঠেছে ছাতার সমারোহে। প্রচ্ছদের এক অর্ধে হলদে ছাতা ফাঁকগুলি সাদা-অন্য অর্ধে ফাঁকগুলি হলদে কিন্তু সাদা ছাতা। ফলে একটা Optical Illussion -এর সৃষ্টি করেছেন সত্যজিৎ এ প্রচ্ছদে। বৃষ্টির
বাঁকা ছাঁট আটকানোর জন্য ছাতাগুলো কখনো চোখে ধরা দেয় আবার কখনো মনে হয় জ্যামিতিক নক্সা। এই জাতীয় Optical Illussionয়ের জাদুকর জার্মান শিল্পী এম. সি. এশার-এর ড্রয়িংয়ের কথা মনে করিয়ে দেয় যা ছিল সত্যজিতের অত্যন্ত প্রিয়। এরই ছাপ সম্পূর্ণ বাঙালি ঘরানায় সত্যজিৎ এনে দিলেন ছাতুবাবুর ছাতার প্রচ্ছদে। আবার লীলা মজুমদারের দিন দুপুরের প্রচ্ছদে হলদে আর কালোর নক্সার সংমিশ্রণে Optical Illussion প্রভাব ফেলা প্রচ্ছদ রচনা করেছেন।

সিগনেট থেকে প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের ধূসর পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদের অক্ষর বিন্যাস দেখে মনে হয় যেন কবি স্বয়ং তাঁর দ্রুত আবেগময়তার টানে তাড়াতাড়ি করে নীল কালিতে নামটা লিখেই চলে গেছেন কোথাও। ছাপার হরফের কোন সাহায্যই সত্যজিৎ নিলেন না এ প্রচ্ছদে। তৈরি করতে থাকলেন বাংলা হরফ নিজস্ব তুলিতে, নিজস্ব ভঙ্গীমাতে।

আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ অসাধারণ মানুষের জীবন কাহিনী যে পরম পুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর প্রচ্ছদ, সেখানে তিনি ব্যবহার করলেন চির পরিচিত নামাবলীর মোটিফ। বুঝিয়ে দিলেন এ বই ধর্মীয় চেতনার বই। নামাঙ্কনে তৈরি করে নিলেন প্রাচীন পুঁথির হরফ। শুধুমাত্র এক রঙে ছাপা হল এ প্রচ্ছদ।

আবার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর অমাবস্যার প্রচ্ছদে যেন অন্ধকার দিয়ে তৈরি এক নারীমূর্তি মনে হয় Cave painting হয়ে আছে
অথচ লীলা মজুমদারের জোনাকির প্রচ্ছদে তুলির আচঁড়ে যেন সত্যিকারের জোনাকি উড়ে উড়ে বেড়ায়, গভীর নীলের জমিতে হালকা নীলের মধ্যে - ছোঁয়া থাকে ইমপ্রেশনিজম পদ্ধতির।

সত্যজিতের প্রচ্ছদ শিল্প, অক্ষর শিল্প এবং বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে থাকলে তা শেষ হয় না - বিনোদবিহারী থেকে শু করে বিদেশি শিল্পের প্রভাবকে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজের দেশের, নিজের ঘরানার করে তুলে আনেন তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভায়।

এমনকি হাল আমলের অফসেটে ছাপার /চার রঙে- পদ্ধতিতে তিনি ছোটদের জন্য লেখা সুজন হরবোলার প্রচ্ছদও রচনা করেন, যেখানে আমরা দেখি সত্যজিতের painting ধর্মী রচনা। আবার নিজের মুখাবয়ব ফটোগ্রাফ ব্যবহার করে তৈরি করেন বিষয় চলচিত্র-র প্রচ্ছদ - যা নিজের লেখা এবং সমস্ত বত্তব্য চিন্তাধারাও নিজের। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, ঋত্বিক ঘটক তাঁর লেখা 'চলচিত্র' মানুষ এবং আরো কিছু বইয়ের প্রচ্ছদ নিজেই এঁকেছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত'/সিগনেট- ২য় সংস্করণের প্রচ্ছদ করেন দু রঙা লাইন ব্লকে যেখানে জমির সাদা রঙে ক্যালিগ্রাফিতে ফুটে ওঠেবইয়ের নাম একই ব্রাশের টানা মাত্রাতে আবার এরই প্রথম সংস্করণের /সিগনেট- প্রচ্ছদ করেন শুভেন্দু বসু। লক্ষ করার বিষয় যে এই প্রচ্ছদ রচনার জন্য লেখকের ভাবনার অন্ত নেই এবং সুধীন দত্ত নিজেই প্রচ্ছদের খসড়া এঁকে পাঠাচেছন প্রকাশকের কাছে। উল্লেখ করা যাক তাঁর চিঠির -

প্রিয়বরেষু,
রবিবার আপনার অফিস নিশ্চয়ই বন্ধ থাকবে ভেবে কাল আর প্রুফ ফেরৎ পাঠাইনি।

লজ্জার সঙ্গে মানতে হচেছ যে প্রথম প্রুফে সব ভুল চোখে পড়েনি। আশা করি এবারেও আর কিছু বাদ গেল না। সে যাই হোক, পেজ প্রুফ পাঠালে অবিলম্বে দেখে দেব।

মলাটের নক্সা একটু বেশী ঘিঞ্জি মনে হচেছ। একটি মাত্র মোটা লাইন যদি কম্বুরেখায় পটের উপর থেকে নিচে নামে প্রথম কুণ্ডলীতে বইয়ের নাম, দ্বিতীয়টিতে লেখকের স্বাক্ষর, এবং তৃতীয়টিতে প্রকাশকের মুদ্রা নিয়ে- তাহলে কেমন দেখাবে? পটভূমিতে স্লেটের রং আর রেখা ও অক্ষর শাদাতে ছাপা যেতে পারে। কতকটা এই রকম - আইডিয়াটা আমার স্ত্রীর, এবং তার বা আমার আঁকার হাত নেই। আপনার অফিসের আর্টিস্ট্ জিনিষটা ঠিক করে এঁকে দেখাতে পারেন। আপনি কখন এলগিন রোডে আসেন জানি না। যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে টেলিফোন করলে আজ সন্ধ্যায় সেখানে যেতে

পারি।
আশা করি আপনার কুশল। ইতি ১১মে ১৯৫৩
ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
ভালো কথা, সুধীন্দ্রনাথ একটা শব্দ ব্যাকরণ ও অর্থের দিক দিয়ে। সেইজন্যে ইংরেজী সইয়ে আমি একটা আদ্যক্ষর ব্যবহার করি।
মলাটের জন্য উল্লিখিত নক্সা যদি অচল ঠেকে, তাহলে মাঝখানে স্থূল কালো রেখায় একটা স্পাইরেল্ এঁকে উপরে ও নীচে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম দিলেও হয়তো চলতে পারে।

।। ১৯ ।।

বাংলা ভাষায় ছাপার অক্ষর বা হরফের প্রকারভেদ অত্যন্ত কম এবং যে কয়েকটা রকমফের পাওয়া যায় তাদের রূপান্তর সম্ভাবনা এতই সীমাবদ্ধ যে তা দিয়ে আলংকারিক বা ব্যঞ্জনধর্মী নক্সা গঠন করা অত্যন্ত কঠিন এবং অসম্ভবই বলা যায়। বাংলার এই হরফকে ভেঙে সম্পূর্ণ অন্য ডিজাইন তৈরি এবং তাকে শিল্পের পর্যায়ে উত্তরণ করে প্রচ্ছদ সৃষ্টির চেষ্টা চলেই আসছে। আর এ ব্যাপারে সত্যজিতের পরই সব থেকে মূল্যবান এবং নান্দনিক কাজ পূর্ণেন্দু পত্রীর। অক্ষর শিল্প বা ক্যালিগ্রাফি অথবা অক্ষরকে বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে রূপান্তরের মধ্যে এর রূপদান অথচ গ্রন্থের সমগ্র ভাব বজায় রাখতে পূর্ণেন্দু পত্রী অতুলনীয়। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদের আর এক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত শিল্পসমৃদ্ধ SymmetricDesign -য়ের প্রয়োগ। পূর্বসূরী নন্দলাল, বিনোদ বিহারী, সত্যজিৎ, খালেদ চৌধুরীর মতই পূর্ণেন্দুও বাংলা অক্ষরের ছাঁদের বিপুল সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভেবেছেন, অক্ষরের নিজস্ব বক্তব্যকে পুরোপুরি ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। ভারবি থেকে প্রকাশিত ১৯৬৭তে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক কাব্যগ্রন্থের নামজ্ঞাপক শব্দের যে অক্ষরের গঠন তাতে দেখা যায় নিশান হাতে শব্দগুলি মিছিলে সামিল হওয়া একটি লোক হয়ে পা বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১-এ ছাপা কৃত্তিবাস প্রকাশনীর নবনীতা দেবসেনের কাব্যগ্রন্থ স্বাগতা দেবদুত লেখাটির অক্ষর সজ্জায়, বিন্যাসে, রূপান্তরে একটি উড়ন্ত বকের রূপ নেয় যেখানে স্বা হয়ে যায় মুখ এবং ঠোঁট আর ‘গ’, ‘ত’ হয়ে যায় খোলা পাখনা। আবার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পরশুরামের কুঠার-এরূপ রূপ পায় কুঠারের, শান্তি লাহিড়ীর বন্দী ময়না কথা কয়না-তে শব্দগুলিকে পংক্তি ভেঙে এমনভাবে সজ্জায় আনা হয়েছে যাতে মনে হয় খোলা আকাশে মুক্ত পাখিরা বিভিন্ন উচ্চতায় উড়ে যাচ্ছে। সোনার মাছি খুন করেছি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে অক্ষরকে ভেঙে গ্রাফিক ফর্ম সৃষ্টি করে হলুদ ও ব্রাউনের মূল ব্যাক গ্রাউণ্ড ও ডিজাইনের সঙ্গে লাল রঙের টাইপে আবার বই এবং কবির নামকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কবিতার ছন্দের, ভাবের ভালবাসাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নক্ষত্র জয়ের জন্য প্রচ্ছদে অক্ষরের বিমূর্ততা এবং টাইপসেটের পুনর্বিন্যাসে ক্ষ অক্ষরটিকে জলস্তম্ভ করে তুলে প্রচ্ছদে অত্যন্ত কাব্যময় এবং গতিশীলতার ছোঁয়া দিয়েছেন। নীল আর বাদামী এই দুই রঙ যেন নক্ষত্রলোক আর পার্থিব জগতের পরিচয় ঘটাতে পেরেছে।

অক্ষর বিন্যাস ছাড়াও বিমূর্ত ফর্মকে নিয়ে প্রচ্ছদ রচনা করেছেন পূর্ণেন্দু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘ক্রীতদাস ক্রীতদাসী’র ১ম সংস্করণের মলাটে। নরনারীর দেহাবয়বের অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় নান্দনিক অথচ বিমূর্ত প্রয়োগ দেখা যায় এতে বোঝা যায় পূর্ণেন্দুর শিল্পচেতনা কতটা Symmetric Design সমৃদ্ধ। কতটা আলংকারিক এবং আলপনা-ধর্মী শিল্প ভাবনা, ১ম সংস্করণের মলাট সাগরময় ঘোষের
একটি পেরেকের কাহিনীর সূর্যের ছবিতে তা প্রকাশ পায়। আবার পরবর্তী আনন্দ সংস্করণে এই বইয়েরই প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু করেন কালো পেরেকের ভরাট ড্রয়িং এর মাধ্যমে অন্য মাত্রায় অন্য ভাবনায়।

প্রতি মুহূর্তে পূর্ণেন্দু ভেবেছেন, করেছেন অসম্ভব ভাঙ্গা গড়ার খেলা। চিন্তা করেছেন এক ফর্ম থেকে রূপান্তরিত হতে হতে অন্য ফর্মে কি ভাবে যাওয়া যায়। এর জ্বলন্ত প্রমাণ আজকাল থেকে ১৯৮৯তে প্রকাশিত শিবরাম চক্রবর্তীর মস্কো বনাম

পণ্ডিচেরীর প্রচ্ছদ। যেখানে মাত্র পাঁচটি ধাপে ওঁ শব্দটি কাস্তে হাতুড়ি তারায়পরিণত হয়, বিপ্লবধর্মী লাল রঙের ব্যাকগ্রাউণ্ডে। আবার তাঁর নিজের বই সিনেমা সিনেমায় /ডি এম, ১৩৮৯- প্রচ্ছদে সিনেমা, সিনেমা, পূর্ণেন্দু পত্রী কথা কয়টি ভাঙতে ভাঙতে নায়ক, নায়িকা এবং Film Strip-এ
রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ যেন Slow Motion-এ সিনেমা দেখারই সামিল।

বণ সেনগুপ্তের পালা বদলের পালাতে পিকাসোর গেরনিকার উগ্র প্রভাব- অথচ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর সেই সময়-য়ে বালুচরী শাড়ীর রূপকলা পরিকল্পনার ধাঁচটি গ্রহণ করেন শাড়ীর নক্সার জেল্লা বাদ দিয়ে। শ্রীপান্থের যখন ছাপাখানা এলোতে ছাপার সীসের ঢালাই অক্ষরের ব্যবহার, প্রচ্ছদটিকে যে স্তরে উত্তীর্ণ করে তা সত্যিই ঐতিহাসিক পর্যায়ের এবং ইন্দ্র মিত্রের ‘কণাসাগর বিদ্যাসাগরেব’ প্রচ্ছদে সমগ্র দুই মলাট জুড়ে বিদ্যাসাগরের স্বাক্ষর অনুভূমিকভাবে ছড়ানো, দুমড়ানো, শ্যাওলা ছোপ ধরা পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া কাগজের উপর ছাপা। গ্রন্থের নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ছাপাখানার বহুল ব্যবহৃত ভিকটোরীয় ও ইংলণ্ডে প্রচলিত আলংকারিক রোমান হরফের ধাঁচে গঠিত। ‘অন্ধকার বারান্দা’র প্রচ্ছদ ধূসর ব্যাক গ্রাউণ্ডের উপর লিপিমালা বিন্যাসে আবছা অন্ধকারে ফুটে থাকা বারান্দার গ্রীলকে প্রকাশ করেছেন আর একেবারে উপরে টাইপস্পেশকে ছোট করে কবির নাম যেন অন্ধকার একটি সীমারেখার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। উলঙ্গ রাজার অক্ষর সজ্জা রূপ নেয় মানবদেহের আকৃতিতে, আবার বুদ্ধদেব বসুর মরচে পড়া পেরেকের গান /ভারবি ১৯৬৬- তে অক্ষর সজ্জা রূপান্তরিত হয় পেরেক সদৃশ মানবমূর্তিতে।

অক্ষরকে কথা বলানোর ব্যাপারে পূর্ণেন্দু সিদ্ধহস্ত, নিজে কবি হয়েও মলাটের যাদুকর পূর্ণেন্দু আবার অক্ষর শিল্পের কবিও। তাই কবি বুদ্ধদেব বসু পূর্ণেন্দুকে মলাট আঁকার ব্যাপারে পরামর্শ দেন, টাইপের নমুনা পাঠান-
কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা - ২৯
টেলিফোন - ৪৬-১২০৪
১/৭/৬৩
কল্যাণীয়েষু,
আমার আর একটা বই ছাপা হচ্ছে - আনুপূর্বিক আমার সমস্ত ছোটোগল্প থেকে বেছে নিয়ে তিরিশটি গল্পের একটি সংকলন, অনেক দিন আগে আমার যে গল্পসংকলন বেরিয়েছিল, দেখেছিলে কিনা জানিনা-তারই পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ বলতে পারো। বইটা প্রকাশ করছেন এম. সি. সরকার, ছাপা হচ্ছে নাভানায়, নাম দিয়েছি।

ভাসো, আমার ভেলা

বেশ মোটা হচ্ছে, অন্তত ৩৫ ফর্মা। সুপ্রিয় কাপড়ে বাঁধতে রাজি হচ্ছে। একটা জ্যাকেট থাকবে, তার রূপসজ্জার জন্য তোমার দ্বারস্থ। আমি ভাবছি শুধু বইয়ের নাম ও লেখকের নামের লেটারিং থাকবে, কোনো হালকা রঙের জমির উপর গাঢ় রঙের ছাপা, এছাড়া আরো একটা আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে তা হলো, বইয়ের নামে যে দুটো ভ ও একটা আ আছে, সেগুলোকে বা তার কোনো একটি বা দুটিকে যদি সাংকেতিক ও সূক্ষ্মভাবে ভেলার বা ডিঙি নৌকার আকার দেয়া যায়। মনে হচ্ছে সবগুলোকে না করে একটা বা দুটো করাই ভালো হবে। লেটারিং ছাড়া অন্য কোনো সাংকেতিক অলংকরণ থাকবে কিনা সেটা তোমার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। বইয়ের আকার ডিমাই ১/৮।

এই তো গেলো জ্যাকেট; ভিতরে কাপড়ের উপর আমি ভাবছি শুধু লেখকের নাম বা শুধু বইয়ের নাম সোনালি জলে engraved থাকবে, পুটে বইয়ের নাম প্রেস-টাইপেও দেয়া যায়।

আমি আর পাচ সপ্তাহের মধ্যে বিদেশে চলে যাচ্ছি, যাবার আগে কভারের সব ব্যবস্থা হওয়া দরকার - সেইজন্য তোম াকে অনুরোধ, যদি খুব অল্প সময়ের মধ্যে জ্যাকেটের ডিজাইন করে এনে আমাকে দেখিয়ে নাও। এই লেটারিঙে বিদ্যাস াগরী টাইপ চাইনা- কিছুটা নতুন ধরণের কোরো - মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে লেখক তাঁর ক্ষুদ্র ভেলা ভাসিয়ে দিচেছন কখন ডুবে যায় তার ঠিক নেই- এই ভাবটা শুধু লেটারিঙেই যদি ইঙ্গিত করা যায়।

Encuonter এর একটা পাতা ছিঁড়ে এইসঙ্গে পাঠালাম, তাতে কয়েকটা ভালো লেটারিং - Strindberg টা আমার খুবই ভালো লেগেছে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তোমাকে ঠিক ঐ ধরণের করতে বলছি - কিন্তু ওটার মধ্যে এমন একটা গুণ আছে যাতে দেখতে দেখতে অনেক কিছু কল্পনা করা যায়, সেটা বাংলা হরফের মৌলিক চরিত্র বজায় রেখে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব কি না ভেবে দেখো। সবচেয়ে বড়ো কথা, খুব শিগ্গির চাই - এক সপ্তাহের মধ্যে অবশ্য।
আশা করি তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল।
বুদ্ধদেব বসু
তোমার তোলা ফোটোগ্রাফটা যাকেই দেখিয়েছি তারই খুব ভালো লেগেছে। চিঠিটার একটা প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ো।

বর্তমান জগতে অফসেট ছাপার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিপুলভাবে ছাপার প্রসার ঘটে। বিভিন্ন রঙে, four colour পদ্ধতিতে ছাপা হতে থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে special colour /সোনালি বা পালি- রঙে fifth বা sixth colour পদ্ধতিতে অত্যন্ত নয়নমনোহর প্রচছদ ছাপা হতে শু হয়। হাল আমলের বহু শিল্পীও প্রচছদে শুধু ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার করে offset পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে সুন্দর প্রচছদ করছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবীর সেন, সোমনাথ ঘোষ, অজয় গুপ্ত-র কাজ। শুধু স টানটোনের রেখা দিয়ে, বিমূর্ত ভাবনায় প্রচছদ করেন যুধাজিৎ সেনগুপ্ত, দেবব্রত ঘোষ প্রমুখ শিল্পীর া। বিমল দাসের জীবন্ত ছবি আঁকা প্রচছদ তো শিশুজগতের এক সম্পদ। ভাবতে হয় তিনি কত সময় দিয়ে এই অবিশ্বাস্য ব াস্তব অথচ শিশুদের কল্পনার জগৎকে ধরেন। অফসেটকে কাজে লাগিয়ে হাল আমলের এক উল্লেখযোগ্য প্রচছদ আনন্দ প াবলিশার্সের 'ব্যোমকেশ সমগ্র' সুনীল শীলের করা। সোনালি foil printing-এ বইয়ের নাম অত্যন্ত আকৃষ্টজনক। মনে হয় সমগ্র বইটিই চামড়ায় বাঁধানো অথচ তা নয়, চামড়া বাঁধানো photograph-এর ব্যবহার সমগ্র প্রচছদে। কৃষেন্দু চ াকী, দেবাশীষ দেব কার্টুনধর্মী শিশুদের জন্য প্রচছদে সিদ্ধহস্ত। তবে কৃষেন্দু চাকীর প্রচছদ শিল্পে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার এবং ছবিতে পটের আদল চোখ কাড়ে।

বর্তমানের কম্পিউটার জগতে যে সব সুবিধা পাওয়া যায় তার ব্যবহারে ভাল প্রচছদ অনেক কম সময়ে অনেক কম শ্রমে করে ফেলা যায়তা ভাবা যায় না। এখন আর হাতে করে, পেন্সিল, রাবার, স্কেল নিয়ে অক্ষর শিল্পের চর্চার প্রয়োজন পড়ে না। যন্ত্রগণকই এই কাজ অনায়াসে করে দেয় তবে যেটা প্রয়োজন হয় তা হল ভাবনা বা মানসিক প্রস্তুতির যা শিল্পীর এক ান্ত নিজের। scanner-এর দৌলতে আজ তাই শরৎচন্দ্রের বই-এর প্রচছদে দেখা যায় খুবই পরিচিত কোন হিন্দী ছবির চটুল স্বভাবী নায়িকার মুখ বা কোন TVserial -এর still -এর দৃশ্য - বিজ্ঞানের দৌলতে সত্যিই চরিত্রহীন হয়ে যায় এই সব প্রচছদ। বই তো শরৎচন্দ্রের, বিক্রি তো হবেই সুতরাং আবরণে কি এসে যায়- অর্থপ্রাপ্তিই সব। নাকি বর্তমানে বিজ্ঞ ানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এসব মানসিক ভাবনার অবনতির প্রমাণ?
১৯৯৯-২০০১ সালের মধ্যে প্রচছদে আর এক আকর্ষণীয় পরিবর্তন আসতে শু করে তা হল প্রচছদে ল্যামিনেশনের

ব্যবহার। যদিও আগেও ল্যামিনেশন হত তবে তা ছিল একটা glossy বা চকচকে ভাব। মনে হত ধুলো ময়লা বা চায়ের দ াগ থেকে রক্ষার জন্য বর্ম। কিন্তু গত কয়েক বছরে শু হল ম্যাট ল্যামিনেশন যা দুর করে দেয় চকচকে ভাব অথচ চোখকে পীড়া দেয় না। তবে একেবারে হাল আমলে এই ম্যাট ল্যামিনেশনের উপরে আবার শু হল spotল্যামিনেশন, যা তৈরি করে দিল অন্য মাত্রা। সমস্ত প্রচছদই ম্যাট-এ করা কিন্তু শুধু বই-এর নাম বা কোন ছবিকে spot lamination-এর সাহ ায্যে করে দেওয়া হল glossy। ফলে আকর্ষণীয় হয়ে

উঠল প্রচ্ছদ। এই পদ্ধতিতে কালো Background-য়ের উপর কালো অক্ষরে ছাপাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলা যায়। আবার এর উপরে সোনালী বা পালি রঙে Emboss বা foilPrint করে অন্য মাত্রার সৌন্দর্য দেওয়া যায়। এই ভাবে করা সমীর সরকারের প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায়ের গল্প ১০১, তসলিমা নাসরিনের আমার ফরাসী প্রেমিক, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতার বনেদী বাড়ি আনন্দ পাবলিশার্সের প্রকাশনায় উল্লেখযোগ্য কাজ। অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ এধরণের কাজ।

।।২০ ।।

এ প্রবন্ধের মূল বত্তব্য পাঠক, প্রকাশক, শিল্পী সবার কাছেই। বইকে সুষ্ঠু সুন্দর করে তুলতে যেমন প্রকাশক চেষ্টা করেন, শিল্পী চেষ্টা করেন, তেমনই পাঠকেরও উচিত সেই চেষ্টাকে, সেই শিল্পকে মর্যাদা দেওয়া। ভাবা উচিত বইয়ের সঙ্গে প্রচ্ছদও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত - একে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না অন্যকে - একে অপরের পরিপূরক। বই সযত্নে রেখে দেওয়ার মতোই প্রচ্ছদও যত্ন করে রাখা - যেন সেই শিল্পীকে, সেই শিল্পীর ভাবনাকে মূল্য দেওয়া তো পাঠকেরই কাজ। আবার এ ব্যাপারে শিল্প সুষমামণ্ডিত, নান্দনিক মূল্যবোধের ঐতিহ্য প্রচ্ছদে রাখা সেও প্রথম দর্শনেই যা পাঠককে তৈরি করে দেয় প্রকাশনালয়ের সম্পর্কে ভাল ধারণা। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে না দেখে আমাদের চিরন্তন সাংস্কৃতিক, সামাজিক দায়িত্বের প্রয়োগ যাতে প্রচ্ছদে থাকে তা দেখা কর্তব্য তো প্রকাশকেরই - এবং সঙ্গে লেখকের দায়িত্ব থেকে যায়। তিনিই তো শিল্পীর সঙ্গে ভাব বিনিময় করে, তাঁর বত্তব্যের স্বপক্ষে শিল্পীর ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুন্দর প্রচ্ছদের অনুরোধ করতে পারেন।

পরিশেষে একটা ছোট গল্প, সত্য ঘটনাই বলা যায় যাকে, তা বলে শেষ করি। কলকাতার কলেজ স্ট্রীট বইপাড়ার ঋষিতুল্য মানুষ ইন্দ্রনাথ মজুমদারকে সকলে চেনেন। তাঁর পরিচিতি শুধুমাত্র বই বিত্রেতা বা প্রকাশক হিসেবে নয় অন্য অনেক ভাবেই আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে তিনি যুত্ত। তবে সুবর্ণরেখা নামে তাঁর, অত্যন্ত একটি চিশীল প্রকাশনা সংস্থা আছে। সেই প্রকাশনা থেকে একবার ছাপা হল শামসের আনোয়ারের কবিতার বই মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে। সবুজ খসখসে কাগজে ছাপা প্রেস টাইপে বই এবং লেখকের নাম কিন্তু প্রচ্ছদের সমগ্র জমি জুড়ে রয়েছে দু রঙে ছাপা একটা সুন্দর নক্সা অথচ symmetry নেই, তা বিমূর্ত - বত্তব্য অনেক কিছুই মনে হয় অনেকগুলো সুতোর জট পাকানো অবস্থা। অত্যন্ত সাধারণ অথচ দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ। ইন্দ্রবাবুর কথায় আরে, তখন পয়সা কোথায় যে, আর্টিস্টকে দিয়ে প্রচ্ছদ আঁকাবো। একদিন রাত্রে কি একটা বিদেশি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাতে গিয়ে দেখি একটা সুন্দর ডিজাইন দিয়ে বিজ্ঞাপন - কিসের তা মনে নেই এখন। ব্যাস পরের দিন, তা ছিঁড়ে নিয়ে, প্রেসে যে ব্লক করে তার কাছে গিয়ে ব্লক করে লাগিয়ে দিলাম শামসের-এর বই-এর কভারে।

এ ঘটনা কি প্রমাণ করে না প্রকাশকের দৃষ্টিভঙ্গির, তাঁর চিশীল প্রকাশনার চিন্তার বইয়ের সমগ্রতাকে ধরার সুষ্ঠু প্রয়াসকে?

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা

দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন - চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। লক্ষ্মীর কৃপালাভ বাঙালীর সাধনা - ব্বিকর্মা। বটতলা - শ্রীপান্থ। কেয়াবাৎ মেয়ে - শ্রীপান্থ। যখন ছাপাখানা এলো - শ্রীপান্থ। ছাপা হরফের হাট -শ্যামল চত্রবর্তী। বাংলা শিশুসাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী - বাণী বসু। শতাব্দীর শিশুসাহিত্য - খগেন্দ্রনাথ মিত্র। কারিগরী কল্পনা ও বাঙালী উদ্যোগ - সিদ্ধার্থ ঘোষ। কণাসাগর বিদ্যাসাগর - ইন্দ্র মিত্র। যামিনী রায় - বিষ্ণু দে। রবীন্দ্র সৃষ্টির অলংকরণ - অভীক দে। শিল্প সংত্রান্ত - পুর্ণেন্দু পত্রী। সিনেমা সিনেমা - পুর্ণেন্দু পত্রী। পুর্ণেন্দু পত্রী শিল্পী ও ব্যত্তি - মঞ্জুষ দুশগুপ্ত সম্পাদিত। খালেদ দা - সুদেষ্ণা বসু।

প্রতিক্ষণ, এক্ষণ, টুকরো কথা, বিভাব (ডি. কে. সংখ্যা), সুন্দরম, যুগান্তর।

ব্যত্তি ঋণ ইন্দ্রনাথ মজুমদার উমা গোস্বামী, দিলীপ ভৌমিক, শর্মিষ্ঠা পাল, সুস্মিতা পাল, সিদ্ধার্থ ঘোষ, প্রণব মুখোপাধ্যায়, রাকেশ সাহানি, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ মাইতি, অনুপ সিংহ, নীহার মজুমদার, পুর্ণেন্দু পত্রী, খালেদ চৌধুরী এবং

কলকাতার কলেজ স্ট্রীট-এর পুরোনো বই বিক্রেতা বন্ধুরা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com